উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করে মিষ্ট ভাষায় ওয়ায না করলে তোমার কথাবার্তা মনে প্রভাব বিস্তার করবে না এবং কেউ সৎপথ পাবে না। সে আলেম ব্যক্তির সামনে হরহামেশা এমনি ধরনের বক্তব্য পেশ করতে থাকে। অথচ এতে তার মূল উদ্দেশ্য থাকে এই আলেমকে রিয়াতে লিপ্ত করে দেয়া, যাতে তার মধ্যে সম্মানপ্রাপ্তি, খাদেমের আধিক্য, জ্ঞান ও যশের অহংকার এবং অপরকে হেয় দৃষ্টিতে দেখার অভ্যাস গড়ে উঠে। সে প্রকাশ্যে শুভেচ্ছার কথা বলে; কিন্তু বাস্তবে আলেম বেচারার সর্বনাশের ফিকির করে। এরূপ আলেমের প্রতি ইশারা করে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

ان الله ليويد هذا الدين بقوم لاخلاق لهم - وان الله ليويد هذا الدين بالرجل الفاجر -

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এই ধর্মকে এমন লোকদের দ্বারা শক্তিশালী করবেন, যারা বেশী দ্বীনদার হবে না। আল্লাহ পাপাচারী ব্যক্তি দ্বারা এই ধর্মকে জোরদার করবেন।

একবার বিতাড়িত শয়তান হযরত ঈসা (আঃ)-এর সামনে এসে আরজ করল ঃ বল, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌। তিনি বললেন ঃ এই কালেমা সঠিক, কিন্তু তোর কথায় আমি এটা উচ্চারণ করব না। এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, শয়তান শুভেচ্ছার ভিতর দিয়েও প্রতারণা করে। শয়তানের এ ধরনের শঠতা গণনাতীত। এসব প্রতারণার কারণে তাদের সর্বনাশ হয়ে যায়, যারা কেবল বাহ্যিক অনিষ্টকেই অনিষ্ট মনে করে এবং শুধু প্রকাশ্য গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। এ খণ্ডের শেষভাগে আমরা শয়তানের কিছু প্রতারণা লিপিবদ্ধ করব। সময় পেলে সম্ভবত এই বিশেষ অধ্যায় সম্পর্কে একটি কিতাবই লেখে তার নাম রাখব 'তালবীসে ইবলীস' (ইবলীসের বিভ্রান্তি)। কেননা, আজকাল শয়তানের প্রতারণা মানুষের মধ্যে বিশেষত মাযহাব ও আকীদাসমূহের মধ্যে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। এর কারণ, মানুষ শয়তানের ধোকাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে নেয়।

অতএব মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, অন্তরে যে ইচ্ছা আসে তাতে বিরতি ও চিন্তাভাবনার মাধ্যমে জেনে নেবে যে, এটা ফেরেশতার পক্ষ থেকে, না শয়তানের পক্ষ থেকে? এটা তাকওয়ার নূর, পর্যাপ্ত এলেম ও অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া জানা যায় না। যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطن تذكروا فاذا

هم مبصرون -

অর্থাৎ, উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাকওয়ার অধিকারীরা শয়তানের স্পর্শ পাওয়ার সময় এলেমের নূর কাজে লাগায়। ফলে তাদের খটকা দূর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাকওয়ার অধিকারী নয়, কামপ্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে সে শয়তানের ধোকায় বিশ্বাস করে নেয় এবং ধ্বংস হয়ে যায়। এ ধরনের লোক সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্যে এমন বিষয় প্রকাশ পেল, যা তারা ধারণাও করত না। অর্থাৎ, তারা তাদের যে সকল আমলকে পুণ্য কাজ মনে করত, সবগুলো পাপকর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এলমে মুয়ামালায় সর্বাধিক সূক্ষ্ম বিষয় হচ্ছে নফ্‌স ও শয়তানের প্রতারণাকে জানা। এটা প্রত্যেক বান্দার উপর ফরযে আইন, কিন্তু মানুষ এ থেকে গাফেল হয়ে এমন এলেমের মধ্যে মশগুল হয়েছে, যদ্দ্বারা কুমন্ত্রণা বৃদ্ধি পায় এবং শয়তান প্রবল হয়।

অধিক কুমন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষার উপায় হচ্ছে অন্তরে প্রবণতা আসার দরজা বন্ধ করে দেয়া। এই দরজা হচ্ছে বাহ্যিক পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং অভ্যন্তরীণ কামপ্রবৃত্তি ও সাংসারিক সম্পর্ক। অন্ধকার গৃহে বসে থাকলে পঞ্চ ইন্দ্রিয় বন্ধ হয়ে যায়। আর পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদ থেকে আলাদা হয়ে অভ্যন্তরীণ কুমন্ত্রণা বন্ধ হয় গেলে। এ পর্যায়ে কেবল তখল্লী তথা নির্জনতার পথ খোলা থাকবে, যা সর্বদা অন্তরে অব্যাহত থাকে। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর যিকির ছাড়া উপায় নেই, কিন্তু শয়তান অন্তরকে সেখানেও ছাড়ে না এবং আল্লাহর যিকির বিস্মৃত করতে থাকে। এমতাবস্থায় মোজাহাদা তথা সাধনা করা উচিত। মৃত্যু দ্বারা এই সাধনা চূড়ান্ত হয়। কেননা, মানুষ যে পর্যন্ত জীবন্ত থাকে, শয়তান থেকে নিষ্কৃতি পায় না। তবে সাধনার বলে শয়তানের আনুগত্য থেকে মুক্ত এবং তার অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু দেহে রক্ত থাকা পর্যন্ত এই সাধনা জরুরী। কেননা, শয়তানের দ্বার সারা জীবন মানুষের সামনে খোলা থাকে, কখনও বন্ধ হয় না। এই দ্বার হচ্ছে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি। দ্বার যখন উন্মুক্ত এবং শত্রুও সজাগ, তখন সাধনা ছাড়া কাজ হবে না।

হযরত হাসান বসরীকে কেউ প্রশ্ন করল ঃ হে আবু সাঈদ! শয়তান নিদ্রামগ্ন হয় কি? তিনি বললেন ঃ যদি সে নিদ্রামগ্ন হত, তবে আমরা শান্তি পেতাম। সারকথা, মুমিন বান্দা শয়তান থেকে মুক্তি পায় না।

তবে তার জোর হ্রাস করতে পারে। হাদীসে আছে ঃ

ان المؤمن ينضى شيطانه كما ينضى احدكم بعيره فى سفره -

অর্থাৎ, তোমরা যেমন উটকে সফরে শীর্ণ করে দাও, তেমনি ঈমানদার ব্যক্তি শয়তানকে শীর্ণ করতে পারে।

হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ মুমিনের শয়তান ক্ষীণ হয়ে থাকে। কায়েস ইবনে হাজ্জাজ বলেন, আমার শয়তান একদিন আমাকে বলতে লাগল ঃ আমি তোমার কাছে উটের মত সবল ও শক্তিশালী এসেছিলাম। এখন তালপাতার সেপাই হয়ে গেছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ এটা কিরূপে? সে বলল ঃ তুমি আল্লাহ্র যিকির দ্বারা আমাকে শীর্ণ করে দিচ্ছ।

এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, যারা তাকওয়ার অধিকারী, তাদের সামনে বাহ্যিক শয়তানী দরজা বন্ধ হওয়া কঠিন নয়, কিন্তু শয়তানী চক্রান্ত থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে তাদেরও পদস্খলন ঘটে যায়। কেননা, এসব চক্রান্ত দ্রুত জানা যায় না। যেমন আমরা আলেমদের সাথে চক্রান্তের একটি দৃষ্টান্ত পূর্বে উল্লেখ করেছি। ব্যাপারটি আরও কঠিন এজন্যে যে, অন্তরের সামনে শয়তানের যেসব দরজা খোলা রয়েছে, সেগুলো অনেক। আর ফেরেশতাদের দরজা মাত্র একটি। এই একটি মাত্র দরজা সবগুলো দরজার মধ্যে সন্দিগ্ধ হয়ে গেছে। এসব দরজার মধ্যে বান্দার অবস্থা এমন, যেমন কোন মুসাফির অন্ধকার রাতে কোন জঙ্গলে দণ্ডায়মান। সেই জঙ্গলে অনেকগুলো দুর্গম পথ রয়েছে। এমতাবস্থায় মুসাফির ব্যক্তি দুই উপায়ে সঠিক পথ জানতে পারে– অন্তর্দৃষ্টি ও জ্ঞান দ্বারা অথবা সূর্যের আলো দ্বারা। অতএব এসব দরজা জানার ব্যাপারে মুত্তাকীর অন্তর দিব্যদৃষ্টি ও জ্ঞানের স্থলে রয়েছে এবং কোরআন ও সুন্নাহর পর্যাপ্ত জ্ঞান হচ্ছে সূর্যালোকের মত। এ দু'উপায়ে অবশ্যই সঠিক পথ জানা যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে– একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের সামনে মাটির একটি রেখা টানলেন, এর পর বললেন ঃ এটা আল্লাহর পথ। অতঃপর এই রেখার ডানে ও বামে অনেকগুলো রেখা টেনে বললেন ঃ এগুলো শয়তানের পথ। প্রত্যেক পথে একটি শয়তান দাঁড়িয়ে মানুষকে তার দিকে ডাকছে। এর পর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل -

অর্থাৎ, এটা হচ্ছে আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথে চল এবং অনেক পথে চলো না।

তিনি ডান ও বাম দিকের রেখাগুলোকেই 'অনেক পথ' বললেন। এই হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) শয়তানের পথ যে অনেক একথাই ফুটিয়ে তুলেছেন। আমরা তার একটি সূক্ষ্ম পথের দৃষ্টান্তও লিপিবদ্ধ করেছি, যে পথে সে আলেম ও আবেদদেরকে পরিচালনা করে। অথচ এরা তাদের কামপ্রবৃত্তিকে বশে রাখতে সক্ষম এবং প্রকাশ্য গোনাহেও লিপ্ত হয় না। এখন আমরা একটি সুস্পষ্ট পথের উল্লেখ করতে চাই। মানুষ কারণে অকারণে এ পথে চলতে শুরু করে।

ঘটনাটি হাদীস শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। বনী ইসরাঈলের মধ্যে জনৈক সংসারত্যাগী দরবেশ ছিল। তাকে বিভ্রান্ত করার জন্যে শয়তান এক কৌশল অবলম্বন করে। সে এক বালিকার গলা টিপে দেয় এবং তার পরিবারের লোকজনের মনে একথা জাগ্রত করে দেয় যে, এর চিকিৎসা অমুক দরবেশের কাছে আছে। সেমতে তারা বালিকাকে দরবেশের কাছে নিয় গেল। দরবেশ প্রথমে চিকিৎসা করতে অস্বীকার করল, কিন্তু তাদের পীড়াপীড়িতে অবশেষে সম্মত হল। তারা বালিকাকে দরবেশের কাছে রেখে গেল। এর পর শয়তান এসে দরবেশকে বালিকার সাথে অপকর্ম করতে প্রলুব্ধ করল। দরবেশ আত্মরক্ষার অনেক চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত শয়তানের প্রতারণার সামনে টিকে থাকতে পারল না। সে অপকর্ম করে বসল। ফলে বালিকাটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে গেল। তখন শয়তান এসে তার মনে একথা সৃষ্টি করল যে, এখন তো তোর লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না। পরিবারের লোকজন আসবে। সে তাদেরকে মুখ দেখাবে কি করে? সুতরাং তাকে হত্যা করে দাফন করে দেয়াই উত্তম। কেউ জিজ্ঞেস করতে এলে বলে দেবে, অসুখে মারা গেছে। দরবেশ তাই করল। এর পর শয়তান বালিকার আত্মীয়দের কাছে যেয়ে তাদের মনে কুমন্ত্রণা দিল যে, দরবেশ বালিকার সাথে এমন এমন করেছে এবং হত্যা করে দাফন করে দিয়েছে। আত্মীয়রা দরবেশের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল। দরবেশ সন্তোষজনক জওয়াব দিতে না পারায় তারা তাকে হত্যার বিনিময়ে হত্যা করার জন্যে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। তখন শয়তান দরবেশের সামনে আত্মপ্রকাশ করে বলল ঃ এগুলো সব আমার কাজ। এখন যদি আমার কথা মেনে নাও, তবে খুন থেকে রক্ষা পেতে পার। দরবেশ শুধাল ঃ কি

করব, বল। প্রাণ তো বাঁচাতে হবে। শয়তান বলল ঃ আমাকে দুটি সেজদা করলেই তুমি বেঁচে যাবে। দরবেশ অগত্যা দু'টি সেজদা করে নিল। সেজদা করার পর শয়তান বলল ঃ আমি কিছুই করতে পারব না। তুমি কে, তাও আমি জানি না। এ ব্যক্তির অবস্থাই আল্লাহ তাআলা কোরআনের নিম্নোদ্বৃত আয়াতে উল্লেখ করেছেন ঃ

كمثل الشيطن اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال انى برئ منك ـ

অর্থাৎ, শয়তানের উক্তির মত, যখন সে মানুষকে বলল ঃ কুফর কর। যখন মানুষ কুফর করল, তখন শয়তান বলল ঃ আমি তোমা থেকে মুক্ত।

চিন্তা করা উচিত, শয়তান কত বড় প্রতারক! সে দরবেশকে কিভাবে কবীরা গোনাহে লিপ্ত করে দিল! দরবেশ তো শুধু চিকিৎসার ব্যাপারে তার কুমন্ত্রণা মেনে নিয়েছিল। এটা খুব সহজ ব্যাপার ছিল। শুরুতে দরবেশ এটাই ভেবেছিল যে, চিকিৎসা করা খুবই ভাল কাজ। এ থেকে জানা গেল, শয়তান প্রথমে মনে এমন বিষয় জাগ্রত করে দেয় যে, মানুষ ভাল কাজে উৎসাহী হওয়ার কারণে তাকে ভাল মনে করে, কিন্তু শেষ পরিণতি তার করায়ত্ত থাকে না। এক বিষয় থেকে আরেক বিষয় এমন সৃষ্টি হয়ে যায়, যা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভবপর হয় না। হাদীসে আছে ঃ

من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه ـ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ স্থানের আশেপাশে ঘুরাফেরা করে, সে যে কোন সময় নিষিদ্ধ স্থানের অভ্যন্তরে চলে যেতে পারে।

শয়তানী পথসমূহের কিঞ্চিৎ বিবরণ

জানা দরকার, মানুষের অন্তর একটি দুর্গ সদৃশ। দুশমন শয়তান এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে একে করতলগত করতে চায়। এখন যদি দুর্গের দ্বারসমূহের হেফাযত করা হয় এবং শয়তানের প্রবেশপথে পাহারা বসানো হয়, তবে অন্তর বিপদ মুক্ত থাকবে, কিন্তু যে ব্যক্তি এর দ্বার সম্পর্কেই অজ্ঞ, সে হেফাযত করতেও অক্ষম। অন্তরকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করা ওয়াজিব। বরং প্রত্যেক বুদ্ধিমান বালেগ বান্দার উপর ফরযে আইন। যে কাজ ফরযে আইন আদায় করার উপায় হয়, তাও ওয়াজিব। এ থেকে জানা গেল, শয়তানী পথ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা ওয়াজিব। বলাবাহুল্য, এসব পথ হচ্ছে বান্দার অন্তহীন স্বভাব ও অভ্যাস, কিন্তু

আমরা এখানে কয়েকটি বড় বড় পথের পরিচয় তুলে ধরব। যেগুলোতে শয়তানী লশকরসমূহের অধিক ভিড় থাকে।

শয়তানের প্রথম প্রবেশপথ হচ্ছে কাম ও ক্রোধ। কেননা, ক্রোধের কারণে জ্ঞানবুদ্ধি রহিত হয়। জ্ঞানবুদ্ধি স্তিমিত হওয়ার সাথে সাথে শয়তানের হামলা শুরু হয়ে যায়। মানুষ যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন শয়তান তাকে নিয়ে এমন খেলা করে, যেমন শিশুরা বল নিয়ে খেলা করে। বর্ণিত আছে, ইবলীস হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে আরজ করল ঃ আপনাকে তো আল্লাহ তাআলা রসূল করেছেন এবং বাক্যালাপের গৌরব দান করেছেন। আমিও তাঁরই সৃজিত। আমা দ্বারা একটি পাপ হয়ে গেছে। এখন আমি তওবা করতে চাই। তওবা কবুল হওয়ার জন্যে আপনি আল্লাহর কাছে আমার পক্ষ থেকে সুপারিশ করুন। হযরত মূসা (আঃ) তার প্রার্থনা কবুল করলেন। তিনি যখন তূর পর্বতে গমন করে আল্লাহর সাথে কথা বলার পর প্রস্থানোদ্যত হলেন, তখন রাব্বুল ইযযত এরশাদ করলেন ঃ হে মূসা! অঙ্গীকার পূর্ণ কর। মূসা (আঃ) আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহ! তোমার বান্দা ইবলীস চায়, তার তওবা কবুল হোক। এরশাদ হল ঃ ইবলীস আদমের কবর সেজদা করলে তার তওবা কবুল হবে। হযরত মূসা (আঃ) ফিরে এসে ইবলীসকে বললেন ঃ তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকার আমি পূর্ণ করেছি। আদেশ হয়েছে, আদমের কবর সেজদা করলে তোমার তওবা কবুল হবে। অভিশপ্ত শয়তান একথা শুনে ক্রুদ্ধ হল এবং অহংকার সহকারে বলতে লাগল ঃ আমি জীবদ্দশায় যাকে সেজদা করিনি, মৃত্যুর পর কেন তার কবর সেজদা করতে যাব? কিন্তু আপনি আল্লাহর কাছে আমার জন্যে সুপারিশ করেছেন, তাই আমার কাছে আপনার হক আছে। আমি একটি বিষয় বলে দিচ্ছি। তিনটি ক্ষেত্রে আপনি আমাকে স্মরণ করবেন। এতে আমি আপনার কোন ক্ষতি করতে পারব না। এক ঃ ক্রোধের অবস্থায়; কেননা, আমার আত্মা আপনার অন্তরে এবং আমার চোখ আপনার চোখে রয়েছে। দেহের যে যে অংশে রক্ত চলাচল করে, আমি সেখানে চলাচল করি। কাজেই ক্রোধের অবস্থায় আমাকে অবশ্যই স্মরণ করবেন। মানুষ যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন আমি তার নাকে ফুঁ দিয়ে দেই। এর পর আমি কি করি, না করি, সে কিছুই টের পায় না। দুই ঃ যুদ্ধের সারিতে আমাকে স্মরণ করবেন। কেননা, যুদ্ধের সারিতে আমি যোদ্ধাকে তার বাড়ী-ঘর, স্ত্রী ও সন্তানদের কথা স্মরণ করিয়ে দেই; যাতে সে পলায়ন করে। তিন ঃ আরও স্মরণ রাখবেন, বেগানা নারীর কাছে তার মাহরামের অনুপস্থিতিতে কখনও বসবেন না।

কারণ, তখন আমি আপনার ও তার মধ্যে পয়গামবাহক হয়ে যাই, যাতে উভয়ে অপকর্মে লিপ্ত হয়। মোট কথা, ইবলীস এতে কামপ্রবৃত্তি, ক্রোধ ও লোভের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। কেননা, আদমকে মৃত্যুর পর সেজদা না করার কারণ ছিল প্রতিহিংসা এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করার কারণ হয় দুনিয়ার লোভ। এগুলো হচ্ছে শয়তানের বড় বড় প্রবেশপথ।

অনুরূপভাবে জনৈক ওলী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ইবলীসকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ মানুষের মনের উপর তুমি কখন প্রবল হও? ইবলীস জওয়াব দিল ঃ ক্রোধ ও খাহেশের সময় আমি তাকে চেপে ধরি। কথিত আছে, শয়তান বলে– মানুষ আমার উপর কোনরূপেই প্রবল হতে পারে না। কেননা, সে যখন হাস্যরত ও আনন্দিত থাকে, তখন আমি তার অন্তরে থাকি আর যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন উড়ে তার মাথায় পৌঁছে যাই।

শয়তানের দ্বিতীয় বড় প্রবেশপথ হচ্ছে হিংসা ও মোহ। এই মোহ মানুষকে অন্ধ ও বধির করে দেয়। হাদীসে আছে ঃ حبك الشئ يعمى ويصم বস্তুর মহব্বত ও মোহ তোমাকে অন্ধ এবং বধির করে দেয়। হিংসা ও মোহের কারণে যখন জ্ঞানের আলো বিদূরিত হয়ে যায়, তখন মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। তখনই শয়তান সুযোগ পায় এবং মোহের বস্তুকে তার দৃষ্টিতে সুন্দর ও সুশ্রী করে দেখায়, যদিও তা বাস্তবে কুশ্রী হয়। হযরত নূহ (আঃ) যখন নৌকায় সওয়ার হন, তখন আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক বস্তুর একটি করে জোড়া তাতে তুলে নেন। নৌকার মধ্যে তিনি জনৈক অপরিচিত বৃদ্ধকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি নৌকায় সওয়ার হলে কেন? সে আরজ করল ঃ আপনার সঙ্গীদের অন্তর নিতে এসেছি। তাদের দেহ আপনার সাথে থাকবে আর অন্তর আমার সাথে। হযরত নূহ (আঃ) বললেন ঃ তুমি তো আল্লাহর দুশমন বিতাড়িত শয়তান। বের হয়ে যাও এখান থেকে। সে আরজ করল ঃ পাঁচটি বিষয় দ্বারা আমি মানুষের সর্বনাশ করব। তন্মধ্যে তিনটি আপনাকে বলে দেব– দু'টি বলব না। ইতিমধ্যে ওহী এল, যে তিনটি বিষয় সে আপনাকে বলতে চায়, সেগুলোর কোন প্রয়োজন নেই। সে দুটি বিষয় জিজ্ঞেস করুন, যেগুলো সে গোপন করতে চায়। তিনি দুটি বিষয় জিজ্ঞেস করলে শয়তান বলল ঃ দু'টি বিষয় হচ্ছে হিংসা ও লোভ। এ দুটি বিষয় কখনও আমাকে ধোকা দেয় না এবং মানুষকে ধ্বংস করার কাজে ভুল করে না। হিংসা তো এমন বিষয়, যদ্দ্বারা আমি অভিশপ্ত ও বিতাড়িত শয়তান হয়েছি। আর লোভ এমন জিনিস যে, আদমের জন্যে একটি বৃক্ষ ছাড়া গোটা জান্নাত বৈধ হয়েছিল; কিন্তু আমি লোভের সাহায্যেই কার্য সিদ্ধ করেছি এবং আদমকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করেছি।

শয়তানের প্রধান প্রধান প্রবেশপথসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে উদরপূর্তি করে আহার করা– যদিও তা হালাল এবং পবিত্র আহার্য বস্তু দ্বারা হয়। কেননা, উদরপূর্তির কারণে কামভাব সতেজ হয়। কামভাব শয়তানের হাতিয়ার। বর্ণিত আছে, ইবলীস অনেকগুলো ফাঁদ হাতে নিয়ে ইয়াহইয়া (আঃ)-এর সামনে উপস্থিত হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই ফাঁদ কেন? সে আরজ করল ঃ এগুলো হচ্ছে কামপ্রবৃত্তি, যদ্দ্বারা আমি মানুষকে কাবু করি। হযরত ইয়াহইয়া শুধালেন ঃ এতে আমার জন্যেও কোন ফাঁদ আছে কি? ইবলীস জওয়াব দিল ঃ হাঁ, আপনি যখন উদরপূর্তি করে আহার করেন, তখন আমি আপনার জন্যে নামায ও যিকির ভারী করে দেই। তিনি আবার শুধালেন ঃ এ ছাড়া আরও কিছু আছে কি? ইবলীস বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ আমিও শপথ করে বলছি, কখনও উদরপূর্তি করে আহার করব না। শয়তান বলল, ঃ আমিও শপথ করছি, মুসলমানের সাথে কখনও শুভেচ্ছার কথা বলব না। কথিত আছে, পেট ভরে আহার করার কুফল ছয়টি। প্রথম, এতে অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় দূর হয়ে যায়। দ্বিতীয়, এতে মানুষের প্রতি দয়া ও অনুকম্পা থাকে না। কেননা, সে সকলকে ভরা পেট মনে করে। তৃতীয়, আল্লাহ তাআলার এবাদত কঠিন হয়ে যায়। চতুর্থ, জ্ঞানের কথাবার্তা শুনে অন্তর নরম হয় না। পঞ্চম, অপরকে উপদেশ দিলে তাতে কারও অন্তর প্রভাবিত হয় না। ষষ্ঠ, উদর রোগব্যাধির আবাসস্থল হয়ে যায়।

শয়তানের আর একটি বড় পথ হচ্ছে সুন্দর জাঁকজমকপূর্ণ আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, গৃহ ইত্যাদি পছন্দ করা। শয়তান যখন এ বিষয়টি মানুষের মধ্যে প্রবল দেখে, তখন সে সর্বদাই প্ররোচিত করে যে, গৃহ খুব উঁচু ও প্রশস্ত তৈরী করে তার ছাদ ও প্রাচীরসমূহ সজ্জিত করা উচিত। এমনিভাবে পোশাক ও সওয়ারীও খুব জাঁকজমকপূর্ণ হওয়া দরকার। এর পর সারাজীবন এতেই নিয়োজিত রাখে। শয়তান একবার মানুষকে এতে নিয়োজিত দেখলে পুনরায় তার কাছে আসার প্রয়োজনও অনুভব করে না। কেননা, মানুষের শখ আপনা-আপনি এক জিনিস থেকে অন্য জিনিসে ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে এই কামনা-বাসনা নিয়েই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায়। এতে পরকালের সর্বনাশ এবং কুফরেরও আশংকা আছে।

শয়তানের অন্যতম প্রবেশপথ হচ্ছে অপরের কাছে লোভ করা। কেননা, অন্তরে লোভ প্রবল হলে শয়তান শিক্ষা দেয় যে, যার কাছে লোভ করা হয়, তার সামনে খুব সাজসজ্জা ও লৌকিকতা প্রকাশ করতে হয়। ফলে তার সামনে এত রিয়া করা হয়, যেন সেই তার মাবুদ ও উপাস্য। তার দৃষ্টিতে প্রিয়পাত্র হওয়ার কৌশল উদ্ভাবনে সে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। তার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের স্থলে জেনেশুনে চুপ করে থাকে। হযরত সফওয়ান ইবনে সলীম রেওয়ায়েত করেন, একবার ইবলীস আবদুল্লাহ্ ইবনে হানযালার সামনে এসে বলল ঃ আমি তোমাকে একটি বিষয় শিখিয়ে দিচ্ছি– মনে রাখবে। তিনি বললেন ঃ তোমার কাছে কিছু শেখার প্রয়োজন আমার নেই। সে বলল ঃ ভাল কথা হলে মনে রাখবে, নতুবা আমার মুখের উপর ছুঁড়ে মারবে। কথা হচ্ছে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও কাছে লোভের কোন বস্তু চাইবে না।

কাজেকর্মে তড়িঘড়ি করা এবং দৃঢ়তা বর্জন করাও শয়তানের একটি প্রবেশপথ। হাদীসে বলা হয়েছে–

العجلة من الشيطان والتانى من الله تعالى

তাড়াহুড়া করা শয়তানের কাজ এবং ধীরে-সুস্থে কাজ করা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়।

এর কারণ হচ্ছে, কাজকর্ম ভেবেচিন্তে করা উচিত। এর জন্যে বিচার-বিবেচনা ও সময়ের প্রয়োজন। তাড়াহুড়ার মধ্যে এটা সম্ভবপর নয়। তড়িঘড়ির মধ্যে শয়তান মানুষের উপর অনিষ্ট চাপিয়ে দেয়; অথচ মানুষ টেরও পায় না। বর্ণিত আছে, যখন হযরত ঈসা (আঃ) ভূমিষ্ঠ হন, তখন শয়তান ইবলীসের কাছে এসে বলল ঃ আজ সকল মূর্তি উপুড় হয়ে গেছে, ব্যাপার কি? ইবলীস বলল ঃ মনে হয় নতুন কোন ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তুমি এখানেই থাক। আমি দেখছি ব্যাপার কি? ইবলীস তখনি ভূপৃষ্ঠে উড়ে গেল; কিন্তু অনেক হন্যে হয়েও কিছু জানতে পারল না। এর পর দেখল, হযরত ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ফেরেশতারা তাঁকে ঘিরে রেখেছে। ইবলীস তার দলের মধ্যে ফিরে এসে বলল ঃ গতরাত্রে একজন পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করেছেন। অথচ যে কোন মহিলা গর্ভবতী হয় অথবা সন্তান প্রসব করে, আমি সেখানে উপস্থিত থাকি, কিন্তু এই শিশুর জন্ম সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। মনে হয় আজ থেকে মূর্তিপূজার আসর তেমন জমবে না। কাজেই তোমরা তড়িঘড়ির সময় মানুষকে বিভ্রান্ত কর।

শয়তানের আরেকটি বড় পথ হচ্ছে টাকা-পয়সা, আসবাবপত্র, বিষয় সম্পত্তি ইত্যাদি। এসব বস্তু যখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়, তখন এগুলোর উপর শয়তানের পাহারা বসে। কোন সচ্ছল ব্যক্তির হাতে যদি অতিরিক্ত একশ' করে টাকা এসে যায়, তবে তার মনে দশটি এমন খাহেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, যার প্রত্যেকটি পূর্ণ করার জন্যে একশ' টাকার প্রয়োজন হয়। ফলে তার কাছে যে পরিমাণ টাকা থাকে, তা দ্বারা কার্যোদ্ধার হয় না; বরং আরও নয়শ' টাকার প্রয়োজন হয়। অথচ যখন একশ' টাকাও ছিল না, তখন সে সচ্ছল ও পরাঙ্মুখ ছিল। সে কেবল মনে করে, একশ' টাকা পেয়ে ধনী হয়ে গেছে; কিন্তু এটা বুঝে না যে, একশ' টাকা পাওয়ার কারণে আরও নয়শ' টাকার অভাবে পড়ে গেছে। এমনিভাবে অধিকতর বস্তুর চিন্তা করতে করতে পরিণামে সে জাহান্নামের যোগ্য হয়ে যায়।

হযরত সাবেত বানানী (রহঃ) বর্ণনা করেন, যখন রসূলে করীম (সাঃ) রেসালতপ্রাপ্ত হন, তখন ইবলীস তার সাঙ্গপাঙ্গকে বলল ঃ নতুন কিছু ঘটেছে। খোঁজ কর। অমনি শয়তানের দল এদিক-ওদিক ছুটে গেল। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে বলল ঃ আমরা কিছুই জানতে পারলাম না। ইবলীস বলল ঃ তোমরা এখানে থাক। আমি খবর আনছি। এর পর সে খবর আনল, আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ (সাঃ)-কে পয়গম্বর করেছেন। এখন তোমরা তাঁর অনুচরদের খবর নাও। শয়তানের দল নিরাশ হয়ে ফিরে এসে বলল ঃ এমন লোক আমরা কখনও দেখিনি। যদি আমরা তাদের দ্বারা কোন গোনাহ করিয়ে নেই, তারা অমনি নামাযে দাঁড়িয়ে যায়। ফলে তাঁদের সকল গোনাহ্ মিটে যায়। ইবলীস বলল ঃ অধীর হয়ো না; কিছু দিন অপেক্ষা কর। যখন তারা দেশ-বিদেশ জয় করবে এবং দুনিয়া তাদের হাতে আসবে, তখন আমাদের কার্য সিদ্ধ হবে।

বর্ণিত আছে, একদিন হযরত ঈসা (আঃ) একটি প্রস্তরখণ্ড মাথার নীচে রেখে দেন। ইবলীস তাঁর কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বলতে লাগল ঃ হযরত, আপনিও দেখা যায় দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তরখণ্ডটি দূরে নিক্ষেপ করে বললেন ঃ এটা দুনিয়াসহ তোর জন্যই। চিন্তা করলে দেখা যায়, যার কাছে বালিশের জায়গায় পাথর থাকে, তার এতটুকু দুনিয়া তো অর্জিত হয়ে যায়, যদ্দ্বারা শয়তান আঘাত হানতে সক্ষম হয়। উদাহরণতঃ যদি কেউ তাহাজ্জুদ পড়ার জন্যে উঠে এবং তার নিকটে একটি পাথরও থাকে, তবে শয়তান অবশ্যই তার মনে একথা জাগ্রত করবে যে, এই পাথরে একটু হেলান দিয়ে নেই।

এমতাবস্থায় ঘুমের প্রতি আকর্ষণ হয়ে যাবে। কেননা, কথায় বলে, গাড়ী দেখলে পা ফুলে। যদি কাছে পাথর না থাকত, তবে মনে এই কল্পনা জাগত না এবং ঘুমের প্রতিও আকর্ষণ হত না। এ হচ্ছে পাথরের অবস্থা, কিন্তু যার কাছে বড় বড় বালিশ, তুলতুলে ফরাশ এবং আরাম-আয়েশের সর্বোত্তম উপকরণ রয়েছে, সে আল্লাহর এবাদত করে কি স্বাদ পেতে পারে?

শয়তানের আরেকটি বড় প্রবেশপথ হচ্ছে কৃপণতা ও দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয়। এ বিষয়টি মানুষকে সদকা, খয়রাত ইত্যাদি কিছুই করতে দেয় না। বরং ধন-সম্পদ স্তূপীকৃত করতে ও পুঁতে রাখতে উৎসাহিত করে। এরূপ লোকদের জন্যে কোরআন মজীদে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির হুমকি উচ্চারিত হয়েছে। খায়সামা ইবনে আবদুর রহমান বলেন ঃ শয়তান বলে, মানুষ আমার উপর যতই প্রবল হোক না কেন, তিনটি বিষয়ে আমার অবাধ্য হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে আমি যা বলি, সে তাই করে। এক, অন্যায়ভাবে কারও ধন-সম্পদ গ্রহণ করা। দুই, ধনসম্পদ অযথা ব্যয় করা এবং তিন, যেখানে ব্যয় করা প্রয়োজন, সেখানে ব্যয় না করা। আবু সুফিয়ান (রহঃ) বলেন ঃ দারিদ্র্যের ভয় দেখানোর চেয়ে বড় কোন হাতিয়ার শয়তানের কাছে নেই। মানুষ এটা মেনে নিলে অন্যায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায় এবং সত্য বিষয় থেকে বিরত থাকে। সে কেবল মতলবের কথাই বলে এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি কুধারণা পোষণ করতে থাকে। ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত করার জন্যে শয়তানের আড্ডা বাজারে উপস্থিত থাকাও কৃপণতা ও লালসার অন্যতম আপদ। হযরত আবু উমামা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ ইবলীস পৃথিবীতে অবতরণ করে পরওয়ারদেগারের কাছে আবেদন করল ঃ ইলাহী, তুমি আমাকে পৃথিবীতে নামিয়ে দিয়ে আপন রহমত থেকে বিতাড়িত করেছ। এখন আমার থাকার জায়গা কোথায়? আল্লাহ বললেন ঃ হাম্মাম (স্নানাগার) তোর থাকার জায়গা। ইবলীস বলল ঃ আমার জন্য একটি বৈঠকখানাও নির্দেশ করা হোক। এরশাদ হল ঃ বাজার ও চৌরাস্তা তোর বৈঠকখানা। ইবলীস আরজ করল ঃ আমার খোরাক কি হবে? উত্তর হল ঃ যে খাদ্যের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় না, সেটাই তোর খোরাক। ইবলীস আরজ করল ঃ আমাকে পানীয় দান করুন। জওয়াব হল ঃ নেশার বস্তু তোর পানীয়। ইবলীস আরজ করল ঃ আমাকে একটি সংবাদ মাধ্যমও প্রদান করা হোক। এরশাদ হল ঃ বাদ্যযন্ত্র তোর সংবাদ মাধ্যম। ইবলীস আরজ করল ঃ আমার শিকার ক্ষেত্র কোন্‌টি হবে?

আল্লাহ বললেন ঃ মহিলারা তোর শিকার ক্ষেত্র।

মত ও পথ সম্পর্কিত বিদ্বেষও শয়তানের একটি বড় প্রবেশপথ। এর সারকথা হচ্ছে, নিজের বিরুদ্ধে মতামত পোষণকারীদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হওয়া ও তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখা। এই দোষ দ্বারা শয়তান আবেদ ফাসেক উভয়েরই সর্বনাশ করে থাকে। কেননা, অন্যের প্রতি দোষারোপ করা এবং তার কুকীর্তি বর্ণনা করা মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। যখন শয়তান এ প্রবৃত্তিকে মানুষের দৃষ্টিতে হক সাব্যস্ত করে, তখন অন্তরে এর প্রতি মোহ জন্মে যায় এবং মানুষ সর্বপ্রযত্নে এতে আত্মনিয়োগ করে। সে মনে করে, সে ধর্মের খেদমত করছে। অথচ বাস্তবে সে শয়তানের অনুসরণ করে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মহব্বতের ব্যাপারে অপরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন; কিন্তু নিজে হারামখোর, মিথ্যাবাদী ও কলহপ্রিয়। তাকে হযরত আবুবকর রাঃ) দেখলে নিজের বড় শত্রু জ্ঞান করতেন। কেননা, তাঁর বন্ধু সেই ব্যক্তি হবে, যে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তাঁর ভাবাদর্শ মেনে চলে এবং বাজে কথাবার্তা থেকে রসনা সংযত রাখে। যেমন– হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজে অনর্থক কথাবার্তা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে মুখে কংকর পুরে রাখতেন। সুতরাং উপরোক্ত ব্যক্তি তাঁর আদর্শ অনুসরণ না করে কিরূপে তাঁর মহব্বত দাবী করতে পারে? অনুরূপভাবে কোন কোন লোক হযরত আলী (রাঃ)-এর মহব্বতের ব্যাপারে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, অথচ নিজে রেশমী বস্ত্র পরিধান করে এবং হারাম ধসসম্পদ দ্বারা খুব জাঁকজমক প্রকাশ করে। অথচ হযরত আলী (রাঃ) খেলাফত আমলেও এমন বস্তু পরিধান করেছেন, যার মূল্য এক টাকার চেয়েও কম ছিল। সুতরাং এমন ব্যক্তির প্রতি তিনি কিরূপে প্রসন্ন হবেন? বরং কেয়ামতের দিন এ ব্যক্তি তাঁর দুশমন হবে।

সারকথা, শয়তানী কল্পনাবিলাসের ফলে এসব লোকের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, যে কেউ হযরত আবু বকর ও হযরত আলী (রাঃ)-এর মহব্বত নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, সে দোযখের অগ্নি থেকে বেঁচে থাকবে। তারা এ হাদীসটি দেখে না যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে এরশাদ করেন ঃ اعمل فانى لاغنى عنك من الله شيئا নিজে আমল কর। কেননা, আমি আল্লাহর সামনে তোমার কোন উপকার করতে পারব না। তাদের অবস্থাও তদ্রূপ, যারা ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ

(রাঃ)-এর ব্যাপারে বিদ্বেষ প্রকাশ করে। অতএব যারা কোন এক ইমামের মাযহাব দাবী করে এবং তাঁর জীবনাদর্শ অবলম্বন করে না, কেয়ামতের দিন সেই ইমামই তাদের বিরুদ্ধে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন ঃ আমার মাযহাব তো আমল ছিল– বাগাড়ম্বর ছিল না। তুমি আমার আমলের বিরুদ্ধাচরণ করলে কেন? হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এরশাদ করেন যে, শয়তান বলে, আমি উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যে যেসকল পাপকর্ম সজ্জিত করেছি, সেগুলোতে তারা আল্লাহর কাছে এস্তেগফার অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করে আমার কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। এর পর আমি এমন গোনাহ্ গড়ে দিয়েছি, যাতে তারা এস্তেগফার করবে না। তা হচ্ছে মনের খাহেশ, যা ধর্মের কাজ মনে করে করা হয়। অভিশপ্ত শয়তানের এ উক্তি সম্পূর্ণ সত্য। কেননা, এ ধরনের কাজে মানুষ জানেই না যে, পরিণামে নাফরমানী হচ্ছে। জানলে তারা অবশ্যই এস্তেগফার করত।

শয়তানের আরেকটি বড় কৌশল, মানুষ আপনা আপনি অপরের পারস্পরিক বিরোধ ও কলহের মধ্যে লেগে যায়। সেমতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ একদল লোক আল্লাহর যিকিরে মশগুল ছিল। শয়তান চাইল, তারা এখান থেকে প্রস্থান করুক এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ুক, কিন্তু কিছু করতে না পেরে সে অপর একটি দলের মধ্যে ভিড়ে গেল, যারা সাংসারিক কথাবার্তায় ব্যাপৃত ছিল। সে তাদের মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি করে দিল। ফলে খুনখারাবী শুরু হয়ে গেল। এতে প্রথম দল যিকির ভঙ্গ করে চলে গেল এবং তাদের মধ্যে আপস-মীমাংসা করে দিল। এখানে শেষোক্ত দলে খুনখারাবী হোক– এটা শয়তানের উদ্দেশ্য ছিল না; বরং প্রথম দলকে স্থানত্যাগে বাধ্য করাই তার লক্ষ্য ছিল।

শয়তানের এক তরীকা হচ্ছে, সে অনভিজ্ঞ জনসাধারণকে আল্লাহ তাআলার সত্তা, গুণাবলী এবং এমন বিষয়সমূহের আলোচনায় জড়িয়ে ফেলে, যা তাদের বোধগম্য নয়। ফলে তারা মূল ধর্ম সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে। তারা আল্লাহ সম্পর্কে এমন ধারণা করতে থাকে, যা কুফর ছাড়া কিছু নয়। হযরত আয়েশার (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

ان الشيطان ياتى احدكم فيقول من خلقك فيقول الله تبارك وتعالى فيقول فمن خلق الله فاذا وجد احدكم ذالك فليقل امنت بالله ورسوله فان ذلك يذهب عنه -

অর্থাৎ, শয়তান তোমাদের কারো কাছে এসে বলে ঃ তোমাকে কে সৃষ্টি করেছে? সে উত্তরে বলে ঃ আল্লাহ তাআলা। এর পর শয়তান জিজ্ঞেস করে ঃ আল্লাহ তাআলাকে কে সৃষ্টি করেছে? তোমাদের কেউ যখন নিজের মধ্যে এই অবস্থা অনুভব করে, তখন সে বলুক– আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এটা বললে তার এই অবস্থা দূর হয়ে যাবে।

এখানে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ ধরনের কুমন্ত্রণার প্রতিকারের আলোচনা করার অনুমতি দেননি। কেননা, এই কুমন্ত্রণা অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে দেখা দেয়– আলেমদের মনে দেখা দেয় না। সুতরাং জনসাধারণের উচিত ঈমান ও ইসলাম প্রকাশ করে এবাদত ও জীবিকা উপার্জনের কাজে মশগুল হয়ে যাওয়া। সাধারণ মানুষ যদি যিনা ও চুরি করে, তবে এটা এ ধরনের কুমন্ত্রণার পেছনে পড়ার চেয়ে উত্তম। কেননা, যে ব্যক্তি না জেনে না শুনে আল্লাহ ও তাঁর ধর্ম সম্পর্কে কিছু বলবে, সে অজ্ঞাতেই কাফের হয়ে যাবে। এটা এমন হবে, যেমন কেউ সাঁতার না শিখে উত্তাল নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শয়তানের দ্বারসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে অপর মুসলমানের প্রতি কুধারণা পোষণ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم -

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছ শুন, তোমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। কারণ, কোন কোন ক্ষেত্রে ধারণা করা পাপ।

সুতরাং যে কেউ অপরের প্রতি কুধারণা করবে, শয়তান তাকে তার গীবত করতেও প্ররোচিত করবে। অথবা সে অপরের হক আদায় করবে সম্মান প্রদর্শনে শৈথিল্য করবে এবং তাকে হেয় দৃষ্টিতে দেখবে। এগুলো সব সর্বনাশা কাজ। এ কারণেই শরীয়তে অপবাদ থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ আছে। হাদীসে আছে اتقوا مواضع التهمة তোমরা অপবাদের স্থান থেকে বেঁচে থাক। স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ) অপবাদের স্থান থেকে আত্মরক্ষা করেছেন। হযরত আলী ইবনে হোসাইন (রাঃ) সফিয়্যা বিনতে হুয়াই থেকে বর্ণনা করেন– তিনি বলেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে এতেকাফরত ছিলেন। আমি যখন তাঁর কাছে গেলাম, তখন ঋতুবতী হয়ে গেলাম। সন্ধ্যায় সেখান থেকে ফিরে আসার জন্যে রওয়ানা

হলে তিনিও আমার সাথে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে দু'জন আনসারীর সাথে দেখা হল। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সালাম করে যেতে লাগল। তিনি তাদেরকে ডাক দিলেন এবং বললেন ঃ এ হচ্ছে আমার স্ত্রী সফিয়্যা– উম্মুল মুমিনীন। তারা আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা আপনার প্রতি সুধারণা রাখি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এটা ঠিক। কিন্তু শয়তান মানুষের সাথে দেহের রক্তের মত মিশে আছে। তাই আমি আশংকা করলাম, কোথাও তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে দেয়। এখানে দেখা উচিত, নবী করীম (সাঃ) উম্মতের প্রতি কতটুকু স্নেহপরায়ণ ছিলেন! তিনি আনসারীদ্বয়কেও বিভ্রান্তি থেকে বাঁচিয়ে দিলেন এবং উম্মতকে অপবাদ থেকে বেঁচে থাকার পন্থাও শিখিয়ে দিলেন, যাতে কোন বিশিষ্ট আলেম ও পরহেযগার ব্যক্তি অপবাদের ব্যাপারটিকে হালকা মনে না করে এবং আত্মম্ভরিতার কারণে এরূপ ধারণা না করে যে, মানুষ তার প্রতি সুধারণাই পোষণ করবে। কারণ, যত বড় পরহেযগারই হোক না কেন, সকল মানুষ তার সমান ভক্ত হবে না; বরং কেউ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং কেউ অসন্তুষ্ট। যারা সন্তুষ্ট, তারা তার দোষ দেখবে না; কিন্তু অসন্তুষ্টরা দোষ গেয়েই ফিরবে। অতএব কুধারণা ও দুষ্ট লোকদের অপবাদ থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। কেননা, দুষ্টরা সকল মানুষের প্রতি কুধারণা রাখে। সুতরাং যখন এমন কোন লোক দেখা যায়, যে মানুষের প্রতি কুধারণা করে এবং তাদের দোষ অন্বেষণ করে, তখন বুঝতে হবে যে, সে নিজের অন্তরে ভ্রষ্টামি পোষণ করে এবং এই দোষ অন্বেষণ তারই বহিঃপ্রকাশ। কারণ, সে সকলকে নিজের মতই মনে করে। জানা দরকার, দোষ অন্বেষণ মোনাফেকের কাজ। মুমিনের বক্ষ সকল মানুষের তরফ থেকে পরিষ্কার থাকে।

এ পর্যন্ত অন্তরের দিকে শয়তানের প্রবেশপথ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বর্ণনা দেয়া হল। তার সবগুলো পথ লিপিবদ্ধ করা আমাদের সাধ্যের বাইরে। তবে জানা উচিত, মানুষের যত মন্দ স্বভাব রয়েছে, সবগুলো শয়তানের হাতিয়ার এবং প্রবেশপথ। এখন প্রশ্ন হয়, শয়তানকে দূরে রাখার উপায় কি এবং তাকে দূরে রাখার জন্যে মুখে "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলে দেয়া যথেষ্ট কি না? জওয়াব, শয়তানের সকল পথ বন্ধ করে দেয়াই অন্তরকে তার কুপ্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখার উপায়। অর্থাৎ, অন্তরকে যাবতীয় মন্দ স্বভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। এর বর্ণনা অত্যন্ত দীর্ঘ। এক খণ্ডে কেবল মারাত্মক স্বভাবগুলো বর্ণনা করাই আমাদের লক্ষ্য। প্রত্যেকটি স্বভাবের জন্যে একটি আলাদা অধ্যায় জরুরী। যেমন

ভবিষ্যতে এর বিশদ বর্ণনা হবে। এখানে এতটুকু বলা জরুরী যে, যখন অন্তর এসব স্বভাব থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন শয়তান তাতে কেবল আনাগোনাই করতে থাকে– স্থায়ীভাবে আসন গাড়ে না। আল্লাহর যিকির এই আনাগোনার পথে বাধা হয়ে যায়। কেননা, অন্তর কুস্বভাব থেকে মুক্ত হলেই যিকির তাতে স্থায়িত্ব লাভ করে, নতুবা যিকিরও কেবল আনাগোনার পর্যায়ে থেকে যায়। অন্তরের উপর তার কোন ক্ষমতা থাকে না এবং শয়তানকেও দূর করতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতে শয়তান দূর করার বিষয়টিকে মুত্তাকীদের সাথে সম্পৃক্ত করে উল্লেখ করেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُونَ -

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা মুত্তাকী, তাদেরকে শয়তান স্পর্শ করলে তারা হুঁশিয়ার হয়ে যায়, অতঃপর তৎক্ষণাৎ চক্ষুষ্মান হয়ে যায়।

মোট কথা, শয়তানকে ক্ষুধার্ত কুকুরের অনুরূপ মনে করতে হবে। কারও কাছে ভাত, মাংস ইত্যাদি না থাকলে কেবল 'ধ্যাৎ' বললেই সরে যাবে; কিন্তু সামনে খাদ্যসামগ্রী থাকলে ক্ষুধার্ত কুকুর অবশ্যই খাদ্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইবে। তখন কেবল 'ধ্যাৎ' বলে কুকুরকে সরানো যাবে না। এমনিভাবে যে অন্তরে শয়তানের খাদ্য নেই, তার কাছ থেকে শয়তান শুধু যিকির দ্বারা সরে যাবে; কিন্তু কামপ্রবৃত্তি প্রবল হলে অন্তর শয়তানের করায়ত্ত হয়ে যাবে এবং আল্লাহর যিকিরকে দূরে সরিয়ে রাখবে। মুত্তাকীদের অন্তর কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ স্বভাব থেকে মুক্ত থাকে বিধায় তাতে শয়তানের আগমন কুপ্রবৃত্তির কারণে নয়; বরং গাফলতির কারণে হয়ে থাকে। যখন তাদের অন্তর যিকির থেকে গাফেল থাকে, তখন নিজের পথ বের করে নেয়। পুনরায় আবার যিকির শুরু করলে শয়তান হটে যায়। এর প্রমাণ, আল্লাহ তাআলা শয়তান দূর করার জন্যে বলেছেনঃ

فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

অতঃপর আশ্রয় প্রার্থনা কর আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে। এমনিভাবে যিকির সম্পর্কিত আরও অনেক আয়াত এবং হাদীস থেকে একথা প্রতীয়মান হয়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে– একবার মুমিনের শয়তান ও কাফেরের শয়তান এক জায়গায় মিলিত হল। কাফেরের শয়তান অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান মসৃণ ও সুন্দর পোশাক

পরিহিত ছিল। অপরপক্ষে মুমিনের শয়তান বিবস্ত্র, শীর্ণ ও ধূলি ধূসরিত ছিল। কাফেরের শয়তান তাকে শুধাল ঃ তুমি এমন শীর্ণ কেন? সে বলল ঃ আমি যার সাথে থাকি, সে পানাহার, বস্ত্র পরিধান এবং মাথায় তেল মালিশ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে। ফলে আমি খানাপানি, বস্ত্র ও তেল পাই না। তাই ক্ষুধার্ত, উলঙ্গ ও এলোকেশী হয়ে থাকি। একথা শুনে কাফেরের শয়তান বলল ঃ ভাই, আমি যার সাথে থাকি, সে এসব কাজে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না। তাই আমি তার সকল কাজে শরীক থাকি। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর এই দোয়া করতেন–

اللهم انك سلطت علينا عدوا بصيرا لعيوبنا يرا نا هو وقبيله من حيث لانراهم اللهم فايسه منى كما ايسته من رحمتك وقنطه منا كما قنطته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين رحمتك -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের উপর এক শত্রুকে ক্ষমতা দান করেছেন, যে আমাদের দোষত্রুটি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। সে এবং তার দলবল আমাদেরকে এমন জায়গা থেকে দেখে, যেখান থেকে আমরা তাদেরকে দেখি না। হে আল্লাহ! অতএব আপনি তাকে আশা থেকে নিরাশ করুন, যেমন তাকে আপনার রহমত থেকে নিরাশ করেছেন। তাকে আমাদের থেকে হতাশ করুন, যেমন আপনার ক্ষমা থেকে হতাশ করেছেন। তার মধ্যে ও আমাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করুন, যেমন তার মধ্যে ও আপনার রহমতের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন।

তিনি বলেন ঃ একদিন মসজিদের পথে শয়তানের সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। সে জিজ্ঞেস করল ঃ আমাকে চেনেন? আমি বললাম ঃ তুমি কে? সে বলল, আমি ইবলীস। আমি শুধালাম ঃ কি উদ্দেশে এসেছ? সে বলল ঃ আমি চাই আপনি এই দোয়া কাউকে না শেখান। আমি আপনার পথে কণ্টক হব না। আমি বললাম ঃ আমি কাউকে নিষেধ করব না। যে কেউ পড়তে পারে। তোমার মনে যা চায় তাই কর। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লা বলেন ঃ এক শয়তান রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে নামাযের অবস্থায় আগুনের মশাল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। কেরাআত ও এস্তেগফারের পরও সে সরে যেত না। এরপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে আরচ করলেন ঃ

আপনি এই দোয়া পাঠ করুন–

اعوذ بكلمات الله التامات التى لايجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما يلج فى الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار -

অর্থাৎ, আমি আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ কালেমাসমূহ দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করি, যেগুলোর খেলাফ করে না সাধু ও অসাধুরা– সেই বস্তুর অনিষ্ট থেকে, যা পৃথিবীতে প্রবেশ করে এবং পৃথিবী থেকে নির্গত হয়, যা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় এবং আকাশে উত্থিত হয়, আর দিবারাত্রির ফেতনার অনিষ্ট থেকে এবং দিবারাতে আগত দুর্ঘটনার অনিষ্ট থেকে।

রসূলে করীম (সাঃ) এই দোয়া পাঠ করলে শয়তানের মশাল নিভে যায় এবং সে উপুড় হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। হযরত হাসান বসরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে– হযরত জিব্রাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে আরজ করলেন, এক শয়তান আপনার সাথে প্রতারণা করতে চায়। আপনি যখন শয্যা গ্রহণ করেন, তখন আয়াতুল কুরসী পড়ে নেবেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

لقد اتانى الشيطن وناز عنى فاخذت بحلقه فوالذى بعثنى بالحق ما ارسلته حتى وجدت برد ماء لسانه على يدى ولولا دعوة سليمان عليه السلام لاصبح طريحا فى المسجد -

অর্থাৎ, আমার কাছে শয়তান এসে বাদানুবাদ শুরু করলে আমি তার গলা টিপে ধরলাম। আল্লাহর কসম! আমি তাকে ততক্ষণ ছাড়িনি, যতক্ষণ না তার থুথুর শীতলতা আমার হাতে অনুভব করলাম। যদি আমার ভাই সোলায়মান (আঃ) দোয়া না করতেন, তবে সে মসজিদে ভূতলশায়ী হয়ে থাকত।

আরও বর্ণিত আছে–

ما سلك عمر فجا الا سلك الشيطن فجا الذى سلك عمر -

অর্থাৎ, হযরত ওমর যে পথে চলেছেন, সেই পথে শয়তান চলেনি। এর কারণ, তাঁর অন্তর শয়তানের প্রবেশপথ ও খাদ্য থেকে পবিত্র

ছিল অর্থাৎ খাহেশের কোন দখল ছিল না। সুতরাং যদি অন্য কোন ব্যক্তি যিকির দ্বারা হযরত ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় শয়তানকে দূরে রাখতে চায়, তবে এটা অসম্ভব। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি ওষুধ সেবন করে কিন্তু পরহেয করে না; অথচ পাকস্থলী দূষিত পদার্থে পরিপূর্ণ। এমতাবস্থায় ওষুধের উপকার আশা করা যায় না। এখানে যিকরকে ওষুধ এবং তাকওয়াকে পরহেয মনে করতে হবে। যে অন্তর আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে মুক্ত, যিকির দ্বারা সেই অন্তর থেকে শয়তান দূর হবে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন–

إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ

–নিশ্চয় এতে চিন্তার বিষয় আছে তার জন্যে, যার অন্তর আছে।

সুতরাং যদি কেউ শয়তান থেকে মুক্তি পেতে চায়, তবে তাকে প্রথমে তাকওয়ার পরহেয অবলম্বন করতে হবে, এরপর যিকিরের ওষুধ সেবন করতে হবে। তাহলেই শয়তান তার কাছ থেকে পলায়ন করবে, যেমন হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছ থেকে পলায়ন করেছিল। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ বলেন ঃ আল্লাহকে ভয় কর এবং বাহ্যত শয়তানকে মন্দ বলো না, যখন অন্তরে তুমি তার বন্ধু অর্থাৎ আজ্ঞাবহ। এক আয়াতে বলা হয়েছে– ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ –তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। এই আয়াত অনুযায়ী দোয়া করা হয়, কিন্তু কবুল হয় না। এমনিভাবে আল্লাহর যিকির করার পরও শয়তান দূর হয় না। কেননা, যিকির ও দোয়ার শর্তসমূহ অনুপস্থিত থাকে। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামকে কেউ জিজ্ঞেস করলঃ বলুন, আমাদের দোয়া কবুল হয় না কেন, অথচ আল্লাহ বলেছেন– তোমরা দোয়া কর, আমি কবুল করব? তিনি জওয়াব দিলেন, তোমাদের অন্তর মৃত। প্রশ্ন করা হল ঃ অন্তর মৃত হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন ঃ আটটি অভ্যাস এর কারণ। ১। তোমরা আল্লাহর হক জেনেও তা পালন কর না। ২। তোমরা কোরআন পাঠ কর, কিন্তু তদনুযায়ী আমল কর না। ৩। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মহব্বত দাবী কর; কিন্তু তাঁর সুন্নত পালন কর না। ৪। মৃত্যুকে ভয় কর, কিন্তু তার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ কর না। ৫। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হচ্ছে তোমরা শয়তানকে শত্রু মনে কর; কিন্তু তোমরা গোনাহের কাজে তার সাথে মিত্রতা কর। ৬। তোমরা দোযখকে ভয় কর বলে দাবী কর; কিন্তু নিজেকে তাতে নিক্ষেপ করেছ। ৭। জান্নাতকে মনে প্রাণে কামনা কর; কিন্তু তার জন্যে কোন কাজ কর না। ৮। সকালে ঘুম থেকে উঠেই

নিজের দোষসমূহ পশ্চাতে ফেলে দাও, আর অন্যের দোষ খুঁজতে শুরু কর। এসব কারণে আল্লাহ তা'আলা নারাজ হয়ে গেছেন। কাজেই দোয়া কবুল করবেন কিরূপে?

একই শয়তান মানুষকে বিভিন্ন পাপাচারের প্রতি আহ্বান করে, না আলাদা আলাদা পাপাচারের জন্যে আলাদা আলাদা শয়তান রয়েছে– এ বিষয়টি জানা এলমে মোয়ামালায় মোটেই জরুরী নয়। এখানে জরুরী হচ্ছে শয়তান থেকে আত্মরক্ষা করা এবং আপন কাজে ব্যস্ত থাকা। কথায় বলে, আম খাও– বৃক্ষ গণনা করো না। এতদসত্ত্বেও বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এ সম্পর্কে যা জানা গেছে, তা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

প্রত্যেক প্রকার গোনাহের জন্যে একটি করে নির্দিষ্ট শয়তান রয়েছে। সেই বিশেষ গোনাহের প্রতি আহ্বান করাই তার কাজ। এই হিসাব অনুযায়ী শয়তানের অসংখ্য দল রয়েছে। কেননা, ঘটনার বিভিন্নতা থেকে কারণের বিভিন্নতা জানা যায়। এ সম্পর্কিত রেওয়ায়েতগুলো নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ শয়তানের সন্তান পাঁচটি । তাদের প্রত্যেককে এক এক কাজ সোপর্দ করা হয়েছে। এক সন্তানের নাম ছিবর। তাকে বিপদাপদের কাজ দেয়া হয়েছে। সুতরাং হা-হুতাশ করা, পরিধানের বস্ত্র ছিন্ন করা, বিলাপ করা ইত্যাদি সব তারই প্ররোচনায় হয়ে থাকে। দ্বিতীয় সন্তানের নাম আওয়ার । তার কাজ হচ্ছে যিনার প্রতি উস্কানি দেয়া। তৃতীয় মবসূত, যাকে মিথ্যাচারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। চতুর্থ ওয়াসেম। সে গৃহে যেয়ে মানুষের সামনে আত্মীয়-স্বজনের দোষত্রুটি পেশ করে এবং তাকে তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ করে তোলে । পঞ্চম জলম্বুর। সে বাজারে থাকে এবং সকল প্রকার গোলযোগ সংঘটিত করে। শয়তানের ন্যায় ফেরেশতাদের মধ্যেও প্রাচুর্য রয়েছে। হযরত আবু উমামা বাহেলীর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

وكل بالمؤمن مائة وستون ملك يذبون عنه ما لم يقدر عليه من ذلك للبصر سبعة املاك يذبون عنه كما يذبون الذباب من قصعة العسل فى اليوم الصائب لو بدأ لكم لرءيتموه على كل سهل وجبل باسطا يده فاعز فاه لو وكل العبد الى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين .

–মুমিনের উপর একশ' ষাট জন ফেরেশতা নিয়োজিত আছে। তারা তার উপর থেকে এমন বিষয় প্রতিহত করে, যার সাধ্য তার নেই। তন্মধ্যে চোখের জন্যে সাত জন ফেরেশতা রয়েছে, যারা এমনভাবে প্রতিহত করে, যেমন গ্রীষ্মকালে মধুর পেয়ালা থেকে মাছি প্রতিহত করা হয়। যাকে প্রতিহত করা হয়, তা যদি তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তবে দেখবে, সে প্রত্যেক নিম্নভূমি ও পাহাড়ের উপর বাহু প্রসারিত এবং মুখ বিস্তৃত করে রয়েছে। যদি মুমিন বান্দাকে এক মুহূর্তের জন্যেও তার নিজের দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া হয়, তবে শয়তানরা তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে।

আইউব ইবনে ইউনুস বর্ণনা করেন– আমি জেনেছি, আদম সন্তানের সাথে জিন সন্তানও জন্মগ্রহণ করে। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে– হযরত আদম (আঃ) পৃথিবীতে অবতরণ করে আল্লাহর কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহ, তুমি শয়তানকে আমার শত্রু করে দিয়েছ। এখন তোমার সাহায্য না হলে আমি তার বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারব না। এরশাদ হল ঃ তোমার যে সন্তান হবে, তার উপর একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে। তিনি আরজ করলেন ঃ আরও বেশী দান করা হোক। আদেশ হল ঃ যদি কেউ একটি পাপ করে, তবে এক পাপেরই শাস্তি ভোগ করবে; কিন্তু পুণ্যের প্রতিদান দশ গুণ থেকে যত বেশী ইচ্ছা আমি দেব। এরপর আরও বেশী সাহায্যের আবেদন করলে আল্লাহ বললেন ঃ যতক্ষণ দেহে আত্মা থাকবে, তওবার দরজা বন্ধ হবে না। অপর দিকে শয়তান আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজ করল ঃ ইলাহী, তুমি মানুষকে আমা থেকে শ্রেষ্ঠ করেছ। এখন আমাকে সাহায্য করা না হলে আমি কিরূপে বিজয়ী হব? এরশাদ হল ঃ আদমের ঘরে যে সন্তান হবে, তার সাথে সাথে তোরও সন্তান হবে। সে আরজ করল, আরও বেশী সাহায্য দান করা হোক। আদেশ হল ঃ দেহে যেমন রক্ত চলাচল করে, তেমনি তুইও তাদের শিরা-উপশিরায় চলাচল করবি এবং তাদের বক্ষে আসন করে নিবি। শয়তান আরও সাহায্যের আবেদন করলে আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ

اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطن الا غرورا .

অর্থাৎ, তাদের বিরুদ্ধে তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী ডেকে

আন। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে তাদের শরীক হয়ে যা এবং তাদেরকে ওয়াদা দে। শয়তান তাদেরকে প্রবঞ্চনা ছাড়া কোন ওয়াদা দেয় না।

হযরত আবু দারদার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

خلق الله الجن ثلاثة اصناف صنف حيات وعقارب وحشاش الارض وصنف فى ظل كالريح فى الهواء وصنف عليهم الثواب والعقاب وخلق الله الانسان ثلاثة اصناف صنف كالبهائم كما قال الله تعالى لهم قلوب لايفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل وصنف اجسامهم كاجسام بنى ادم وارواحهم ارواح الشياطين .

–আল্লাহ তাআলা জিনকে তিন শ্রেণীতে সৃষ্টি করেছেন। এক শ্রেণী হচ্ছে সর্প, বিচ্ছু ও কীটপতঙ্গ। আরেক শ্রেণী হচ্ছে শূন্যস্থিত বায়ুর ন্যায়। আরেক শ্রেণীর কারণে সওয়াব ও আযাব দেয়া হয়। মানুষকেও আল্লাহ তাআলা তিন শ্রেণীতে সৃষ্টি করেছেন। এক শ্রেণী চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়। যেমন আল্লাহ্ নিজে বলেন ঃ তাদের অন্তর আছে, যদ্দ্বারা তারা হৃদয়ঙ্গম করে না; তাদের চক্ষু আছে, যদ্দ্বারা দেখে না এবং তাদের কর্ণ আছে, যদ্দ্বারা শ্রবণ করে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং আরও নিকৃষ্ট। আরেক শ্রেণী এমন, যাদের দেহ মানুষের দেহের মত; কিন্তু আত্মা শয়তানদের মত। আরেক শ্রেণী তারা, যারা কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার ছায়ায় থাকবে। সেদিন আল্লাহ তাআলার ছায়া ছাড়া কোন ছায়া হবে না।

ওহায়ব ইবনুল ওরদ বলেন ঃ শয়তান একবার হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর খেদমতে এসে বলল ঃ আমি আপনাকে উপদেশ দিতে চাই। তিনি বললেন ঃ তোর উপদেশের কোন প্রয়োজন আমার নেই। তবে আদম সন্তানদের অবস্থা বর্ণনা কর। শয়তান বলল ঃ আমাদের কাছে আদম সন্তানরা তিন ভাগে বিভক্ত। এক প্রকার তারা, যাদের কাছে আমরা যাই এবং প্ররোচনা দিয়ে বশীভূত করি; কিন্তু তারা এস্তেগফার ও তওবা করতে শুরু করে। ফলে আমাদের জমানো খেলা পণ্ড হয়ে যায়। পুনরায় যদি আমরা কিছু প্রচেষ্টা চালাই, তবে তারা পরেও তাই করে। এ প্রকার মানুষ আমাদের জন্যে খুবই কঠিন। দ্বিতীয় প্রকার মানুষ আমাদের

হাতে এমন থাকে, যেমন খেলোয়াড়ের হাতে বল থাকে। তাদেরকে আমরা যেদিকে ইচ্ছা পরিচালনা করি। এদের ব্যাপারে আমাদের কোন ভাবনা নেই। তৃতীয় প্রকার তারা, যারা আপনার মত নিষ্পাপ। তাদের উপর আমাদের কোন কারসাজি চলে না।

প্রকাশ থাকে যে, শয়তান আসল আকৃতিতেও দৃষ্টিগোচর হয় এবং বিভিন্ন আকৃতিতেও। তবে শয়তান সকলের দৃষ্টিগোচর হয় না। ফেরেশতাগণের অবস্থাও তদ্রূপ। তাদের আসল আকৃতিও আছে। নবুওয়তের নূর দ্বারা তাদের আসল আকৃতি দেখা যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত জিব্রাঈলকে আসল আকৃতিতে মাত্র দু'বার দেখেছিলেন। একবার তিনি স্বয়ং হযরত জিব্রাঈলকে তার আসল আকৃতি দেখানোর জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। সেমতে জিব্রাঈল হেরা পর্বতে আসল আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। দ্বিতীয়বার মেরাজের রাতে সিদরাতুল মুন্তাহায় তাকে আসল আকৃতিতে দেখেন। এছাড়া অন্যান্য সময় জিব্রাঈল হযরত দেহইয়া কালবী (রাঃ)-এর আকৃতিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে আগমন করেছেন। দেহইয়া কালবী (রাঃ) নেহায়েত সুশ্রী ছিলেন।

অধিকাংশ সময় কাশ্ফবিশিষ্ট বুযুর্গগণের সামনে আসল আকৃতির মিছাল তথা নমুনা ভেসে উঠে। উদাহরণতঃ শয়তান জাগ্রত অবস্থায় আকৃতি ধারণ করে তাদের দৃষ্টির সামনে আসে। তখন তারা শয়তানকে দেখেন এবং কথাও শুনেন। বলাবাহুল্য, কাশ্ফবিশিষ্ট বুযুর্গগণ জাগ্রত অবস্থায় এমন বিষয় জানতে পারেন, যা অন্যরা কেবল স্বপ্নেই জানতে পারে। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে এই মর্মে দোয়া করে– ইলাহী, আমাকে মানুষের অন্তরের সেই স্থান দেখান– যেখানে শয়তান থাকে। এরপর সে স্বপ্নে দেখল, এক ব্যক্তির দেহ স্বচ্ছ স্ফটিকের মত; অর্থাৎ তার ভিতরের সবকিছু বাইরে থেকে দেখা যায়। শয়তান ব্যাঙের আকৃতিতে তার বাম ঝুটিতে কাঁধ ও কানের মধ্যস্থলে বসে আছে। সে তার চিকন ও লম্বা শুঁড় লোকটির অন্তরে প্রবেশ করিয়ে সেখান থেকেই কুমন্ত্রণা দিচ্ছে। লোকটি যখন যিকর করে, তখন শয়তান সরে যায়। এমনি ধরনের ব্যাপার কখনও জাগ্রত অবস্থায় হুবহু দেখা যায়। সেমতে জনৈক কাশফবিশিষ্ট বুযুর্গ দেখেন, শয়তান কুকুরের আকৃতি ধারণ করে মৃতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং মানুষকে সেদিকে আহবান করছে। অর্থাৎ, তিনি দুনিয়াকে মৃতের আকারে দেখতে পান।

যিকিরের সময় কুমন্ত্রণা ছিন্ন হয় কি না

প্রকাশ থাকে যে, অন্তরের অবস্থা প্রত্যক্ষকারী আলেমগণের এ বিষয়ে মতামত পাঁচ প্রকার। একদল আলেমের মত হচ্ছে, যিকির দ্বারা কুমন্ত্রণা ছিন্ন হয়ে যায়। কেননা, রসূলে করীম (সাঃ)-এরশাদ করেন– فاذا ذكر الله خنس অর্থাৎ বান্দা যখন আল্লাহর যিকির করে, তখন শয়তান চুপ হয়ে যায়। দ্বিতীয় দলের উক্তি হচ্ছে, মূল কুমন্ত্রণা দূর হয় না– তার প্রভাব বিনষ্ট হয়ে যায়। কারণ, যখন যিকির দ্বারা অন্তর পূর্ণ হয়ে যায়, তখন কুমন্ত্রণা প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। যেমন কোন ব্যক্তি চিন্তামগ্ন হয়ে বসে থাকলে কথার আওয়ায শুনেও তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তৃতীয় দলের অভিমত হচ্ছে, কুমন্ত্রণাও ছিন্ন হয় না এবং প্রভাবও বিনষ্ট হয় না; বরং প্রভাব স্তিমিত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, কুমন্ত্রণা হয়, কিন্তু খুবই দুর্বল! চতুর্থ দল বলেন, সামান্য সময়ের যিকির দ্বারা কুমন্ত্রণা খতম হয়ে যায় এবং ততটুকু সময়ের কুমন্ত্রণা দ্বারা যিকির খতম হয়ে যায়। যিকির ও কুমন্ত্রণা একের পর এক দ্রুতগতিতে আসার কারণে একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা চালু হয়ে যায়। উদাহরণতঃ একটি গোলকের গায়ে কয়েকটি আলাদা বিন্দু বসিয়ে যদি গোলকটিকে দ্রুতগতিতে ঘুরানো হয়, তবে সেই বিন্দুগুলো একটি গোলাকার চক্র বলে মনে হবে। কেননা, দ্রুতগতির কারণে বিন্দুগুলো মনে হবে যেন একটি অপরটির সাথে মিলিত। এই দল প্রমাণ পেশ করেন যে, উপরোক্ত হাদীসে 'শয়তান চুপ হয়ে যায়' বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা যিকর করার সময় কুমন্ত্রণা অনুভব করি। এমতাবস্থায় উভয়ের মধ্যে সমন্বয় বর্ণিত উক্তি অনুযায়ীই হতে পারে। পঞ্চম দলের অভিমত হচ্ছে, কুমন্ত্রণা ও যিকির অন্তরের উপর সর্বদা একে অপরের পেছনে চলে এবং বিচ্ছিন্ন হয় না। কোন ব্যক্তি একই অবস্থায় যেমন আপন চক্ষু দ্বারা দুই বস্তু দেখতে পারে, তেমনি অন্তরও দুই বস্তুর অবস্থানস্থলে হতে পারে। হাদীসে আছে ঃ

ما من عبد الا وله اربعة اعين عينان فى راسه يبصر بهما امر دنياه وعينان فى قلبه يصبر بها امر دينه ـ

–প্রত্যেক বান্দার চারটি করে চক্ষু আছে। দুটি তার মস্তকে, যদ্দ্বারা সে তার দুনিয়ার ব্যাপারাদি দেখে এবং দু'টি অন্তরে, যদ্দ্বারা সে

আখেরাতের বিষয়াদি প্রত্যক্ষ করে। এটি হযরত মুহাসেবীর মাযহাব। আমাদের মতে সবগুলো উক্তিই সঠিক, কিন্তু সর্বপ্রকার কুমন্ত্রণার কথা কোন এক উক্তিতে বর্ণিত হয়নি। প্রত্যেকেই যেমন কুমন্ত্রণা দেখেছেন, তেমনি বর্ণনা করেছেন। তাই আমরা এক্ষণে কুমন্ত্রণার প্রকারভেদ বর্ণনা করব।

কুমন্ত্রণা তিন প্রকার। প্রথম, সত্য বিষয়কে সন্দিগ্ধ করে কুমন্ত্রণা দেয়া। উদাহরণতঃ শয়তান এভাবে বুঝাবে যে, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ত্যাগ করা উচিত নয়। জীবনের অনেক কামনা-বাসনা এতদিন বিসর্জন দেয়া আযাব বৈ নয়। এসময় যদি বান্দা আল্লাহ তা'আলার হক, তাঁর বিরাট পুরস্কার ও শাস্তিকে স্মরণ করে এবং নিজেকে বুঝায় যে, কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকা অবশ্যই কঠিন; কিন্তু জাহান্নামের অগ্নি সহ্য করা আরও অধিক কঠিন, তবে শয়তান প্রশ্রয় পাবে না, পালিয়ে যাবে। কেননা, শয়তান এ কথা বলবে না যে, দোযখের কষ্ট গোনাহ থেকে বিরত থাকার কষ্টের তুলনায় হালকা এবং একথাও বলবে না যে, গোনাহের পরিণতি দোযখ ভোগ নয়। যদি বলেও, তবে কোরআনে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে বান্দা তার কথা শুনবে না। অনুরূপভাবে যদি আত্মম্ভরিতার জন্যে কুমন্ত্রণা দেয় এবং অন্তরে একথা জাগ্রত করে যে, আজ মারেফত ও এবাদতে তোমার সমতুল্য কেউ নেই, তবে শয়তান হটে যাবে। যদি বান্দা স্মরণ করে যে, তার মারেফত, অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্তই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন; সুতরাং আত্মম্ভরিতা কিসের? মোট কথা, এই প্রথম প্রকারের কুমন্ত্রণা সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়ে যায়। যারা আরেফ এবং ঈমানের আলোকে আলোকিত, তাদের কাছে এই প্রকার কুমন্ত্রণা থাকতে পারে না।

দ্বিতীয়, কাম-প্রবৃত্তিকে গতিশীল করে কুমন্ত্রণা দেয়া। যদি কাম-প্রবৃত্তিকে এমন বিষয়ের প্রতি গতিশীল করে, যার সম্পর্কে বান্দা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে যে, এটা গোনাহ, তবে শয়তান কামভাব উত্তেজিত করা থেকে বিরত হবে না ঠিক; কিন্তু এমন উত্তেজিত করবে না, যাতে গতিশীলতা থাকে। পক্ষান্তরে যদি এমন বিষয়ের প্রতি গতিশীল করে, যার গোনাহ হওয়ার ব্যাপারে বান্দা নিশ্চিত নয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুমন্ত্রণা প্রভাবশালী হবে এবং তা দূর করার জন্যে সাধনার প্রয়োজন হবে। এমতাবস্থায় কুমন্ত্রণা থাকবে; কিন্তু স্তিমিত অবস্থায় থাকবে।

তৃতীয়, অনুপস্থিত বিষয় স্মরণ করিয়ে কুমন্ত্রণা দেয়া। এতে অন্তর

যখন যিকিরের প্রতি মনোনিবেশ করে, তখন কুমন্ত্রণা কিছুটা দূর হয়ে যায় এবং পুনরায় এসে পড়ে। আবার দূর হয়ে যায় এবং আবার আসে। এমনিভাবে যিকির ও কুমন্ত্রণা একের পর এক আসতে থাকে। ফলে ধারণা হতে থাকে যে, উভয়েরই একটি অব্যাহত ধারা সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং যেন উভয় বিষয়ের ঠিকানা অন্তরে দুটি জায়গা। এ ধরনের কুমন্ত্রণা সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হওয়া সুকঠিন, তবে অসম্ভব নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

من صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشئ من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه .

—যে ব্যক্তি দু'রাকআত এমনভাবে নামায পড়ে যে, তাতে তার মন দুনিয়ার কোন কথা না বলে, তার পূর্বেকার সকল গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

সুতরাং এটা অসম্ভব হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার উল্লেখ করতেন না। হাঁ, আল্লাহর মহব্বতে পরিবেষ্টিত অন্তরেই এটা সম্ভব। কেননা, অন্তর যে বিষয়ে পুরোপুরি ব্যস্ত থাকে, সে বিষয় ছাড়া অন্তরে অন্য কোন কিছু আসে না। যেমন আশেক ব্যক্তি এশকের চিন্তায় নিমজ্জিত থাকলে তার অন্তরে মাশুকের কথা ছাড়া অন্য কিছু আসে না। সুতরাং কুমন্ত্রণার উপরোক্ত প্রকারত্রয় থেকে বুঝা যায়, বর্ণিত পাঁচটি মাযহাবই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সত্য।

সারকথা, এক মুহূর্ত অথবা কিছু সময়ের জন্যে শয়তান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব নয়; কিন্তু সারা জীবনের জন্যে তার কবল থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই অবান্তর; বরং অসম্ভব। কেননা, এটা সম্ভবপর হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কোন সময় কোন কুমন্ত্রণা হত না। অথচ কুমন্ত্রণা তাঁরও হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত আছে– একবার নামাযে তিনি আপন বস্ত্রের কারুকার্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। নামাযান্তে সেই বস্ত্র খুলে দূরে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন ঃ شغلني من الصلوة এটা আমাকে নামাযে বাধা দিয়েছে। পুরুষের জন্যে স্বর্ণ হারাম হওয়ার পূর্বে একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে একটি স্বর্ণের আংটি ছিল। খোতবা পাঠ করার সময় সেটির উপর দৃষ্টিপাত হলে তিনি তা খুলে দূরে নিক্ষেপ করেন এবং বলেন– نظرة اليه ونظرة اليكم تولدت –আমি একবার এর দিকে এবং একবার তোমাদের দিকে দেখি। বস্ত্রের কারুকার্য ও স্বর্ণের আংটির

দিকে দৃষ্টিপাত করার কারণ ছিল কুমন্ত্রণা। তাই তিনি এগুলো দূরে নিক্ষেপ করলেন। এ থেকে বুঝা যায়, সাংসারিক আসবাবপত্র ও টাকা পয়সার কুমন্ত্রণা তখনই ছিন্ন হবে, যখন এগুলো আলাদা করে দেয়া হবে। যে পর্যন্ত মালিকানায় একটি টাকাও থাকবে, শয়তান তারই কুমন্ত্রণা দেবে। একে কিভাবে মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপন রাখা যায়, কিভাবে ব্যয় করা যায় এবং কিভাবে প্রকাশ করে বড়লোকী ফুটানো যায় ইত্যাদি বহু প্রকার কুমন্ত্রণা অন্তরে আসতে থাকবে। সুতরাং দুনিয়ার কাজ-কারবারে জড়িত হয়ে যে ব্যক্তি আশা করে যে, সে শয়তান থেকে মুক্তি পাবে, তার অবস্থা সেই ব্যক্তির মত, যে সর্বাঙ্গে মধু মেখে মনে করতে থাকে যে, এর উপর মাছি বসবে না। এটা অসম্ভব।

মোট কথা, দুনিয়া কুমন্ত্রণার একটি সুবৃহৎ ফটক। এতে গমন পথ একটি নয়– অসংখ্য। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ শয়তান প্রথমে মানুষের কাছে গোনাহের দিক থেকে আসে। এতে মানুষ অবাধ্য হলে উপদেশের ছলে আগমন করে এবং কোন বেদআতের সাথে জড়িত করে দেয়। এতেও মানুষ অবাধ্য হলে তাকে কঠোরতার আদেশ দিয়ে যা হারাম নয়, তাও হারাম করার প্রয়াস পায়। এতেও কাজ না হলে ওযু ও নামাযে সন্দেহ সৃষ্টি করে। যদি এতেও কার্য সিদ্ধি না হয়, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্যে সৎকর্ম সহজ করে দেয়। অতঃপর সৎকর্মপরায়ণতার সুবাদে মানুষ যখন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন শয়তান তাকে আত্মম্ভরিতার বেড়াজালে ফাঁসিয়ে দিয়ে ধ্বংস করে দেয়। এ কাজে শয়তান তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে এবং কোন ত্রুটির অবকাশ রাখে না। কেননা, শয়তান জানে, এ ফাঁদে আটকা না পড়লে সে সোজা জান্নাতে চলে যাবে।

পরিবর্তনের দিক দিয়ে অন্তরের প্রকারভেদ

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, অন্তর বিভিন্ন পথে প্রভাবিত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে এক অন্তর এমন, যার উপর চতুর্দিক থেকে তীর বর্ষিত হতে থাকে। একদিক থেকে কোন কিছুর প্রভাব তার উপর পড়লে দ্বিতীয় দিক থেকে তার বিপরীত কোন প্রভাব এসে যায়। ফলে প্রথম প্রভাব পরিবর্তিত হয়ে যায়। উদাহরণতঃ যদি শয়তান অন্তরকে মানসিক খেয়াল-খুশীর দিক থেকে টানে, তবে ফেরেশতা এসে তাকে সেই বিষয় থেকে বিরত রাখে। যদি এক শয়তান একটি মন্দ কাজ করতে বলে, তবে অন্য শয়তান তাকে অন্য দিকে টেনে নেয়। যদি এক ফেরেশতা অন্তরকে এক বস্তুর দিকে আকৃষ্ট করে, তবে অন্য ফেরেশতা অন্য বস্তুর দিকে

উৎসাহিত করে। সুতরাং অন্তর কখনও দু'ফেরেশতার টানা হেচঁড়ার মধ্যে থাকে, কখনও দু'শয়তানের এবং কখনও এক ফেরেশতা ও এক শয়তানের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের শিকার হয়, কিন্তু কোন সময়েই অবসর পায় না। নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে–

ونقلب افئدتهم وابصارهم

–আমি তাদের হৃদয় ও নয়নযুগল পাল্টে দেই।

আল্লাহ তাআলা অন্তরকে এক অভিনব বস্তুরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং একে অনেক আশ্চর্যজনক বস্তু দ্বারা পূর্ণ করে রেখেছেন। এসব আশ্চর্যজনক বস্তু ও তার পরিবর্তন সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্যক অবহিত করা হয়েছিল। তাই তিনি প্রায়ই এভাবে কসম খেতেন ঃ ومقلب القلوب –অন্তর পরিবর্তনকারীর কসম।

এছাড়া তিনি প্রায়ই এই দোয়া করতেন– يامقلب القلوب ثبت قلبى على دينك হে অন্তর পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আমার অন্তরকে আপনার ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করতেন– ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনিও অন্তরের ব্যাপারে ভীত? তিনি বলতেন– আল্লাহ ইচ্ছা করলে অন্তরকে সোজা রাখেন এবং বক্র করতে চাইলে বক্র করে দেন। এক রেওয়ায়েতে আছে– অন্তর চড়ুই পাখীর মত সর্বক্ষণ নাচানাচি করতে থাকে। হাদীসে অন্তরের আরও দুটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে–

مثل القلب فى تقلبه كالقدر اذا استجمعت غليانها .

–পরিবর্তনের ব্যাপারে অন্তর ডেগের মত, যখন তাতে খুব স্ফুটন আসে।

অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

مثل القلب كمثل ريشة الارض ملاة تقلبها الرياح ظهر البطن

–অন্তর জঙ্গলের পাখীর মত, যাকে ঝড়ের বায়ু ওলট পালট করতে থাকে।

যারা আপন আপন অন্তরের অবস্থা দেখা-শুনা করে এবং

মোরাকাবায় মগ্ন থাকে, কেবল তারাই অন্তরের উপরোক্ত পরিবর্তন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারে।

ভাল অথবা মন্দের উপর অন্তরের প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং এতদুভয়ের মধ্যে দোদুল্যমান থাকার ব্যাপারে অন্তর তিন প্রকার। প্রথম প্রকার সেই অন্তর, যা তাকওয়া ও খোদাভীতিতে পূর্ণ, সাধনা দ্বারা পরিশোধিত এবং কুঅভ্যাস থেকে পাক পবিত্র। এরূপ অন্তরে অদৃশ্যের ভাণ্ডার ও ঊর্ধ্বজগত থেকে প্রেরণা আসে এবং জ্ঞান-বুদ্ধি সেই প্রেরণা নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় ব্যাপৃত হয়, যাতে তার কল্যাণ ও উপকারিতার রহস্য অবগত হওয়া যায়। এরপর অন্তর্দৃষ্টির নূর দ্বারা যখন রহস্য অবগত হয়ে যায়, তখন জ্ঞান-বুদ্ধি বলে দেয় যে, এ কাজটি করা জরুরী। ফেরেশতা এই অন্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখে, এর মূল উপাদান পরিষ্কার, বুদ্ধিমত্তার নূরে আলোকিত এবং ফেরেশতাদের থাকার যোগ্য। তখন বহু ফেরেশতা তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে এবং একের পর এক অসংখ্য সৎকাজের প্রতি তাকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। এসব সৎকাজ তার জন্যে সহজও করে দেয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى -

–অতঃপর যে দান করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং উত্তমকে গ্রহণ করে, আমি তার জন্যে সুখকর পরিণামের পথ সহজ করে দেই।

এই প্রকার অন্তরে মারেফতের সূর্য উদিত হয়, যার কিরণে গোপন শেরকও অদৃশ্য থাকে না। অথচ গোপন শিরক অন্ধকার রাতে কাল পিঁপড়ার গতির চেয়েও অধিক রহস্যাবৃত থাকে। এমনিভাবে অন্যান্য গোপন বিষয়ও এই অন্তরের কাছে গোপন থাকে না। ফলে শয়তানের কোন চক্রান্ত সফল হয় না। শয়তান দাঁড়িয়ে প্রতারণার অনেক মাসআলাযুক্ত কথা বলে; কিন্তু অন্তর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। এই প্রকার অন্তর যখন বিনাশকারী বিষয়াদি থেকে পাক সাফ হয়ে যায়, তখন শোকর, সবর, ভয়, আশা, সংসারের প্রতি অনাসক্তি, মহব্বত, সন্তুষ্টি, আগ্রহ, তাওয়াক্কুল, চিন্তাভাবনা, আত্মজিজ্ঞাসা ইত্যাদি উদ্ধারকারী গুণাবলী দ্বারা বিভূষিত হয়ে যায়। এরূপ অন্তরের প্রতিই আল্লাহ তাআলা অভিনিবেশ করেন এবং এরই নাম 'কলবে মুতমাইন্নাহ' তথা প্রশান্ত অন্তর, যা এই আয়াতে বুঝান হয়েছে– الا بذكر الله تطمئن القلوب

–খবরদার, আল্লাহর যিকির দ্বারা অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।

নিম্নোক্ত আয়াতে এই অন্তরই উদ্দেশ্য–

يايتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك

–অর্থাৎ, হে প্রশান্ত মন, তুমি তোমার পরওয়ারদেগারের দিকে প্রত্যাবর্তন কর।

দ্বিতীয় প্রকার অন্তর প্রথমটির বিপরীত। অর্থাৎ, খেয়াল-খুশীতে পরিপূর্ণ। বদভ্যাস দ্বারা কলুষিত। এই প্রকার অন্তরের সামনে শয়তানের দরজা থাকে উন্মুক্ত এবং ফেরেশতাদের দরজা তালাবদ্ধ। এরূপ অন্তরে অনিষ্টের সূচনা এভাবে হয় যে, প্রথমে তার মধ্যে মানসিক খেয়াল-খুশীর একটি শংকা জাগরিত হয়। সে শাসক জ্ঞান-বুদ্ধির কাছে উপযোগিতা জিজ্ঞেস করে। কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি পূর্ব থেকেই খেয়াল-খুশীর সেবায় অভ্যস্ত থাকে, সর্বদা তার খাতিরে কৌশল আবিষ্কারে রত থাকে এবং তারই মর্জি অনুযায়ী কাজ করে। তাই এখনও নফসেরই সহযোগিতা করে এবং তদনুযায়ী জওয়াব দেয়। ফলে খেয়াল-খুশীর বক্ষ উন্মোচিত হয়ে যায় এবং তার তমসা বিস্তৃতি লাভ করে। জ্ঞান-বুদ্ধি পরাভূত হয়ে যায়। শয়তান সুযোগ পেয়ে খুব পা ছড়ায় এবং বাহ্যিক সাজসজ্জা, প্রতারণা, দীর্ঘ আশা এবং এমনি ধরনের অসার বিষয়সমূহের প্রতি উৎসাহিত করতে থাকে। অবশেষে ঈমানের শাসন দুর্বল এবং বিশ্বাসের প্রদীপ নির্বাপিত হয়ে যায়। অর্থাৎ, আল্লাহর ওয়াদা, শাস্তি ও পরকাল ভীতির বিশ্বাস অবশিষ্ট থাকে না। কেননা, খেয়াল-খুশীর একটি কাল ধূম্র নির্গত হয়ে অন্তরের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং অন্তরের নূরকে নিষ্প্রভ করে দেয়। জ্ঞান-বুদ্ধির অবস্থা তখন এমন হয়ে যায়, যেমন কারও চোখ তীব্র ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে গেলে সে দেখতে পারে না। কামভাবের প্রাবল্যের দরুন অন্তরের অবস্থা এমনি হয়ে যায়। হিতাহিত জ্ঞান ও সুমতি মোটেই থাকে না। সদুপদেশ হৃদয়ঙ্গম করে না এবং তৎপ্রতি কানও লাগায় না। এমতাবস্থায় শয়তান হামলা করে। কামভাবে উত্তেজনা দেখা দেয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খেয়াল-খুশীর ইচ্ছানুযায়ী গতিশীল হয়। এই প্রকার অন্তরের প্রতিই নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে ইশারা করা হয়েছে–

ارءيت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا -

অর্থাৎ, আপনি কি সেই ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করেছেন, 'যে তার

খেয়াল-খুশীকে আপন উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? আপনি কি তার দায়িত্ব নেবেন? না, আপনি ধারণা করেন যে, তাদের অধিকাংশ লোক শ্রবণ করে অথবা বুঝে? তারা চতুষ্পদ জন্তু বৈ নয়; বরং তাদের পথ আরও অধিক ভ্রষ্ট।

لقد حق القول على اكثرهم فهم لايؤمنون

–তাদের অধিকাংশের জন্যে আল্লাহর শাস্তিবাণী অবধারিত হয়ে গেছে। অতএব তারা ঈমান আনবে না।

وسواء عليهم ءانذرتهم ام لم تنذرهم لايؤمنون তাদেরকে সতর্ক করা এবং না করা তাদের জন্যে সমান। তারা ঈমান আনবে না।

কতক অন্তরের অবস্থা সকল প্রকার কাম-বাসনার ক্ষেত্রে এরূপই হয়ে থাকে এবং কোন কোন অন্তর কতক কাম-বাসনার বেলায় এরূপ হয়। উদাহরণতঃ কতক লোক কতক গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে; কিন্তু যখন কোন সুশ্রী চেহারার উপর দৃষ্টি পতিত হয়, তখন সংযম হারিয়ে ফেলে, বুদ্ধি-বিবেচনা বিদায় হয়ে যায় এবং অন্তরের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না। কিছু লোক জাঁকজমক, প্রতিপত্তি ও অহংকারের সামগ্রী দেখলে তা অর্জন করার জন্যে পাগলপারা হয়ে যায়। আবার কতক লোক নিজের সম্পর্কে কোন অপমানজনক উক্তি ও সমালোচনা শুনলে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যায়। কেউ কেউ টাকা-পয়সা নেয়ার সময় এমন রূঢ় হয়ে যায় যে, ভদ্রতা ও খোদাভীতির রীতিনীতি সম্পূর্ণ ভুলে যায়। এ সবের কারণ, অন্তর খেয়াল-খুশীর কাল ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং অন্তর্দৃষ্টির নূর ঘোলাটে হয়ে যায়। ফলে লজ্জা-শরম, ঈমান ও ভদ্রতাকে শিকায় রেখে শয়তানী অভিপ্রায় অর্জনের চেষ্টায় লেগে যায়।

তৃতীয় প্রকার অন্তর এমন, যার মধ্যে খেয়াল-খুশীর প্রবণতা প্রকাশ পায় এবং তাকে অনিষ্টের দিকে আকৃষ্ট করে। তখনই ঈমানের প্রবণতা আসে এবং তাকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে। কামপূজারী নফস তখন অনিষ্টের প্রবণতার পক্ষপাতিত্ব করতে তৎপর হয়ে উঠে। এ সময় কামভাব কিছুটা প্রবল হয় এবং ভোগবিলাস ও আনন্দ ভাল মনে হতে থাকে। অতঃপর জ্ঞান-বুদ্ধি কল্যাণমুখী প্রবণতার প্রশংসা করে এবং কামপ্রবৃত্তির অনিষ্ট বর্ণনা করে বলে ঃ এটা মূর্খতার কাজ এবং চতুষ্পদ ও হিংস্র জন্তুদের আচরণের অনুরূপ, যারা পরিণামের পরওয়া করে না এবং কুকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নফস জ্ঞান বুদ্ধির এই উপদেশের প্রতি আকৃষ্ট

হয়। এ সময় শয়তান জ্ঞান-বুদ্ধির উপর হামলা চালায় এবং বলে ঃ শুষ্ক বৈরাগ্য কেমন? তুমি কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে বিরত হও কেন? দুনিয়ার আরও মানুষ কি ভোগবিলাসে মত্ত নয়? তোমার ভাগ্যে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ ছাড়া কিছু নেই। মানুষ তোমাকে দেখে হাসবে। দেখ, অমুক অমুক ব্যক্তি ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে কেমন সুখে দিন যাপন করছে। তুমি মর্তবায় তাদেরকে ডিঙ্গিয়ে যাও না কেন? অমুক আলেম ব্যক্তিও তো তাই করে। নিষিদ্ধ হলে সে এরূপ করত না। এ ধরনের কথা শুনে নফস শয়তানের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তখন ফেরেশতা শয়তানের উপর চড়াও হয় এবং অন্তরকে এভাবে বুঝায়– যে ব্যক্তি ভোগ-বিলাসের পেছনে পড়ে এবং পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করে না, সে ধ্বংস হয়ে যায়। তুমি কি ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাসে সন্তুষ্ট হয়ে চিরস্থায়ী বেহেশতী সুখ বর্জন করতে চাও? তুমি কি দোযখের আযাবের ভয়াবহতা কল্পনা করে কামপ্রবৃত্তিতে সবর করার কষ্ট সহ্য করতে পার না? অপরের অনুকরণে তুমি নিজের ব্যাপারে গাফেল হয়ে যাচ্ছ। এটা মস্ত বড় ধোঁকা। অপরের গোনাহ তোমার আযাব হালকা করবে না। অন্য মানুষ যদি জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর রৌদ্রতাপে চলাচল করে এবং তোমার একটি শীতল গৃহ থাকে, তবে তুমি অন্যদের সাথে রৌদ্র তাপের কষ্ট ভোগ করবে, না আপন গৃহে সুখে থাকবে? যদি অপরের সাথে রৌদ্রতাপে দাঁড়িয়ে থাকতে তোমার ভয় লাগে, তবে অপরের সাথে দোযখের আযাবে প্রবেশ করতে ভয় কর না কেন? এই উপদেশের ফলে নফস ফেরেশতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এভাবে সে শয়তান ও ফেরেশতা উভয়ের দ্বন্দ্বে জড়িত থাকে। এমতাবস্থায় যদি অন্তরে শয়তানী স্বভাব প্রবল থাকে, তবে শয়তানেরই অনুগত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি ফেরেশতার স্বভাব প্রবল থাকে, তবে শয়তানী প্ররোচনাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং আখেরাতের উপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রতি বিন্দুমাত্রও আকৃষ্ট হয় না; বরং আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে নেয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে এমন কাজই প্রকাশ পায়, যদ্দ্বারা আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। এটি তাকদীরগত ব্যাপার। কেননা, হাদীস অনুযায়ী মুমিনের অন্তর আল্লাহ তা'আলার দু'অঙ্গুলির ফাঁকে অবস্থিত। অর্থাৎ শয়তান ও ফেরেশতা এই উভয় পক্ষের মধ্যে প্রায়ই দ্বন্দ্ব লেগে থাকে এবং অন্তর এদিক-ওদিক পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু এক পক্ষের দিকে চিরকাল অটল থাকা খুবই কম। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد فى السماء ـ

–আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার বক্ষ সংকীর্ণ করে দেন, যেন সে সজোরে আকাশে আরোহণ করে।

অন্য আয়াতে বলেন ঃ

ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده -

–যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, তবে কেউ তোমাদের উপর প্রবল হবে না। আর যদি তিনি তোমাদেরকে ত্যাগ করেন, তবে তাঁর পরে তোমাদের সাহায্য কে করবে?

এ থেকে জানা গেল, পথ প্রদর্শন ও পথভ্রষ্টকরণ তাঁরই কাজ। তাঁর আদেশ কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না এবং তাঁর ফয়সালা কেউ বিলম্বিত করতে পারে না। তিনিই জান্নাত সৃষ্টি করে তার জন্যে কিছু লোককে সৃষ্টি করেছেন এবং তেমনি কাজে নিয়োজিত করেছেন। দোযখও তাঁরই তৈরী এবং এর জন্যে কিছু লোক সৃজিত হয়েছে। তাদেরকেও তেমনি কাজে লাগানো হয়েছে। মোটকথা, আল্লাহর ব্যাপার অনেক উর্ধ্বে– لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون তিনি যা করেন, তজ্জন্যে কারও কাছে জিজ্ঞাসিত হবেন না। কিন্তু মানুষ জিজ্ঞাসিত হবে।

এ পর্যন্ত অন্তরের আশ্চর্যজনক অবস্থাসমূহের সামান্যই বর্ণিত হল। এর পূর্ণ বর্ণনা এলমে মোয়ামালায় সমীচীন নয়; বরং এলমে মোয়ামালার সূক্ষ্ম বিষয়াদি বুঝার জন্যে যতটুকু দরকার ততটুকু বর্ণনা করেই এ আলোচনা সমাপ্ত করা হচ্ছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাধনা, চরিত্র সংশোধন ও আন্তরিক রোগের চিকিৎসা

জানা উচিত, সচ্চরিত্রতা নবীকুল শিরোমণি (সাঃ)-এর একটি উজ্জ্বল গুণ। সিদ্দীকগণের আমলসমূহের মধ্যে এটাই সর্বোত্তম। প্রকৃতপক্ষে অর্ধেক দ্বীনদারী, পরহেযগারদের সাধনার ফল এবং আবেদদের অধ্যবসায়ের পরিণতি একেই বলা উচিত। পক্ষান্তরে অসচ্চরিত্রতা মারাত্মক বিষতুল্য। অপমান, লাঞ্ছনা, অপকীর্তি ও অখ্যাতি এর মাধ্যমেই হয়। এটা মানুষকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য থেকে দূরে নিক্ষেপ করে এবং শয়তানের দলে গ্রথিত করে দেয়। মোট কথা, অসচ্চরিত্রতা অন্তরের এমন ব্যাধি, যদ্দ্বারা চিরন্তন জীবন বিনষ্ট হয়ে যায়। দৈহিক রোগ কেবল দৈহিক জীবনকেই ব্যাহত করে।

চিকিৎসকগণ এমন রোগের চিকিৎসা করে, যদ্দ্বারা ধ্বংসশীল জীবনের ধারা বাধাগ্রস্ত হয়। এজন্যে তারা নীতিমালা, রোগ নিরূপণ ও উপসর্গ নির্ণয় পদ্ধতির প্রতি মনোনিবেশ করে। সুতরাং অন্তরের যেসব ব্যাধির কারণে চিরন্তন জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে, সেগুলোর চিকিৎসার জন্যেও আইন-কানুন রচনা করা অত্যাবশ্যক। এই চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির উপর ওয়াজিব। কেননা, প্রত্যেক অন্তরে কোন না কোন ব্যাধি অবশ্যই থাকে। যদি এর চিকিৎসা করা না হয়, তবে এ থেকে শত শত দুরারোগ্য ব্যাধি জন্মলাভ করতে পারে। কাজেই অন্তরের এই রোগ চেনা, তার কারণসমূহ জানা এবং এর সুচিকিৎসার জন্যে তৎপর হওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে অপরিহার্য। কোরআনের বাণী قد افلح من زكها (যে একে শুদ্ধ করে, সে সফলকাম হয়।) –এতে অন্তরের চিকিৎসাই উদ্দেশ্য। আমরা এই পরিচ্ছেদে অন্তরের কতক রোগ ও তার চিকিৎসা সংক্ষেপে বর্ণনা করব। বিস্তারিত বর্ণনা পরে পৃথকভাবে আসবে।

সচ্চরিত্রতার ফযীলত ও অসচ্চরিত্রতার নিন্দা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় নবী (সাঃ)-এর প্রশংসায় স্বীয় নেয়ামত প্রকাশ করে বলেন ঃ

انك لعلى خلق عظيم

–নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চরিত্র ছিল কোরআন। কোরআন পাকে বলা হয়েছে–

خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجهلين ـ

অর্থাৎ, ক্ষমা অবলম্বন করুন, সৎকাজের আদেশ করুন এবং মূর্খদের থেকে নিবৃত্ত থাকুন।

এই আয়াত নাযিল হলে পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিব্রাঈলকে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি আরজ করলেন, আল্লাহ পাকের কাছ থেকে না জানা পর্যন্ত এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। অতঃপর জিব্রাঈল আকাশে গেলেন এবং ফিরে এসে আরজ করলেন ঃ এর উদ্দেশ্য, যে আপনার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে, আপনি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবেন। যে আপনাকে না দেয়, আপনি তাকে দেবেন এবং যে আপনার প্রতি অন্যায় করে, আপনি তাকে ক্ষমা করবেন। এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

بعثت لاتمم مكارم الاخلاق

অর্থাৎ, আমি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দান করার উদ্দেশে প্রেরিত হয়েছি।

তিনি আরও বলেন ঃ

اثقل ما يوضع فى الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق

অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন দাঁড়িপাল্লায় সর্বাধিক ভারী বস্তু যা রাখা হবে, তা হবে আল্লাহর ভয় ও সচ্চরিত্রতা।

এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে এসে জিজ্ঞেস করল ঃ ধর্ম কি? তিনি বললেন ঃ সচ্চরিত্রবান হওয়া। এরপর লোকটি ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে এবং পেছন দিক থেকে এসে একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল। তিনিও প্রত্যেক বার তাকে একই জওয়াব দিলেন, অবশেষে বললেন ঃ اما تفقه هو ان لاتغضب –তুমি কি বুঝ না? এটা হচ্ছে তোমার ক্রুদ্ধ না হওয়া। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল ঃ অশুভ ব্যাপার কি?

তিনি বললেন ঃ سؤ الخلق অর্থাৎ, অসচ্চরিত্রতা। এক ব্যক্তি আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় কর। সে আরজ করল ঃ আরও বলুন। এরশাদ হল ঃ কোন গোনাহ্ হয়ে গেলে তার পশ্চাতে সৎকাজ কর। এতে সেই গোনাহ্ মিটে যাবে। লোকটি বলল ঃ আরও বলুন। তিনি বললেন ঃ خالق الناس بخلق حسن মানুষের প্রতি সচ্চরিত্রতা প্রদর্শন কর। অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ঃ উত্তম আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ সচ্চরিত্রতা। হযরত ফোযায়ল থেকে বর্ণিত আছে– রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কেউ বলল, অমুক মহিলা দিনে রোযা রাখে এবং রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে, কিন্তু তার চরিত্র খারাপ। সে মুখ দ্বারা পড়শীদেরকে পীড়ন করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ لاخير فيها هى من اهل النار তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই; সে দোযখী।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ আমি নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি– সর্বপ্রথম দাঁড়িপাল্লায় যে বস্তু ওজন করা হবে, তা হবে সচ্চরিত্রতা ও দানশীলতা। আল্লাহ তাআলা যখন ঈমান সৃষ্টি করলেন, তখন ঈমান বলল ঃ ইলাহী, আমাকে শক্তি দান কর। সেমতে আল্লাহ তাকে সচ্চরিত্রতা ও দানশীলতা দ্বারা শক্তিশালী করলেন। কুফর সৃষ্টি করার পর সেও আল্লাহর কাছে শক্তি প্রার্থনা করল। আল্লাহ তাকে কৃপণতা ও অসচ্চরিত্রতা দিয়ে জোরদার করলেন। হযরত জারীর ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, আমাকে আল্লাহর রসূল (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা তোমাকে সুশ্রী করেছেন। অতএব তুমি তোমার চরিত্রও সুন্দর কর। বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন ঃ রসূল (সাঃ) সর্বাধিক সুশ্রী ও সর্বাধিক চরিত্রবান ছিলেন। হযরত আবু মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দোয়া ছিল এই– اللهم حسنت خلقى فحسن خلقى হে আল্লাহ, আপনি আমাকে দৈহিক সৌন্দর্য দান করেছেন। অতএব আমার চরিত্রকেও সুন্দর করুন। ওসামা ইবনে শরীক (রাঃ) বলেন ঃ আমি একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলাম। তখন বেদুঈনরা তাঁকে জিজ্ঞেস করছিল– বান্দাকে সর্বোৎকৃষ্ট বস্তু কি দান করা হয়েছে? তিনি বললেন ঃ সচ্চরিত্রতা। বর্ণিত আছে, একদিন হযরত ওমর (রাঃ) রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর কাছে কয়েকজন কোরায়শ মহিলা সমবেত ছিল এবং জোরে জোরে কথা

বলছিল। হযরত ওমরের আওয়ায শুনে তারা দ্রুতবেগে পর্দার আড়ালে চলে গেল। হযরত ওমর (রাঃ) গৃহে প্রবেশ করে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হাস্যরত পেলেন। তিনি হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ কয়েকজন মহিলার আচরণ আমার হাসির কারণ। একটু আগে তারা আমার কাছে ছিল। তোমার আগমন টের পেয়ে তারা পর্দার আড়ালে চলে গেছে। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ হুযুর, আপনিই তো ভয় করার অধিক যোগ্য ছিলেন। এরপর তিনি মহিলাদের উদ্দেশে বললেন ঃ বেকুবরা, তোমরা আমাকে ভয় কর, আর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ভয় কর না? তারা জওয়াব দিল ঃ হাঁ, তোমাকেই ভয় করি। কেননা, তুমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তুলনায় রূঢ়। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ

يـا ابـن الـخـطـاب والذى نـفـسـى بـيـده مـا لقـيـك الـشـيـطـان قـط سـالـكا فـجـا الاسلك فـجـا غـيـر فـجـك ـ

অর্থাৎ, হে ইবনুল খাত্তাব, আল্লাহর কসম! শয়তান যখন তোমাকে কোন পথে চলতে দেখবে, সে তোমার পথ ছেড়ে অন্য পথে চলবে।

এক হাদীসে আছে ঃ ان الـعـبـد لـيـبـلـغ مـن سـوء خـلـقـه اسـفـل درك جـهـنـم –নিশ্চয় বান্দা তার অসচ্চরিত্রতার কারণে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে যায়।

লোকমান হাকীমকে তার পুত্র জিজ্ঞেস করল ঃ মানুষের মধ্যে কোন্ স্বভাবটি উত্তম। তিনি বললেনঃ ধর্মপরায়ণতা। পুত্র বলল ঃ দুটি হলে কোন্ কোন্টি উত্তম? তিনি বললেন ঃ ধর্মপরায়ণতা ও ধনাঢ্যতা। প্রশ্ন হল ঃ তিনটি হলে কোন্ কোন্টি উত্তম? উত্তর হল ঃ ধর্মপরায়ণতা, ধনাঢ্যতা ও লজ্জাশীলতা। আবার প্রশ্ন হল ঃ চারটি হলে কোন্ কোন্টি উত্তম? জওয়াব হল ঃ ধর্মপরায়ণতা, ধনাঢ্যতা, লজ্জাশীলতা ও সচ্চরত্রিতা। পুত্র আবার জিজ্ঞেস করল ঃ যদি পাঁচটি হয়? তিনি বললেন ঃ ধর্মপরায়ণতা, ধনাঢ্যতা, লজ্জাশীলতা, সচ্চরিত্রতা ও দানশীলতা। প্রশ্ন হল ঃ যদি ছয়টি হয়? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ বৎস, এই পাঁচটি স্বভাবের সমাবেশ ঘটলেই মানুষ পরিষ্কার পরহেযগার, আল্লাহর ওলী ও শয়তান থেকে মুক্ত হয়ে যায়। বেশীর কি প্রয়োজন? হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ যে অসচ্চরিত্রতা প্রদর্শন করে, সে নিজেকে পীড়ন করে। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন ঃ মানুষ তার সচ্চরিত্রতার বদৌলত জান্নাতের উচ্চস্তরে

পৌঁছে যায়, যদিও এবাদত না করে এবং অসচ্চরিত্রতার কারণে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যায়, যদিও সে আবেদ হয়। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ বলেন ঃ চরিত্রহীন মানুষ ছিদ্রযুক্ত মৃৎপাত্রের ন্যায়, যা জোড়া লয় না এবং মাটিও হয়ে যায় না। বর্ণিত আছে, একবার হুযর ইবনুল মোবারকের সঙ্গে জনৈক অসচ্চরিত্র ব্যক্তি সফরে রওয়ানা হয়। তিনি তাকে খুব আদর যত্ন করতে থাকেন। সফরের পর যখন লোকটি আলাদা হয়ে গেল, তখন তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন। লোকেরা ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ তার প্রতি আমার করুণা হয়। আমি তার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছি; কিন্তু তার অসচ্চরিত্রতা তার সাথেই রয়ে গেছে– আলাদা হয়নি। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী বলেন ঃ মানুষের চারটি অভ্যাস এমন যে, আমল ও এলেম কম হলেও সে উচ্চ মর্তবা লাভ করতে পারে। অভ্যাসগুলো হচ্ছে– সহনশীলতা, নম্রতা, দানশীলতা ও সচ্চরিত্রতা। ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ অসচ্চরিত্রতা এমন একটি বিপদ, যা থাকলে সৎ কর্মের আধিক্যও উপকারী হয় না। পক্ষান্তরে সচ্চরিত্রতা এমন শোভা যে, এটা থাকলে মন্দ কাজের প্রাচুর্যও তেমন ক্ষতিকর হয় না। হযরত ইবনে আব্বাসকে কেউ বংশমর্যাদা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ যার চরিত্র যত বেশী ভাল, সে বংশমর্যাদায় ততবেশী সম্ভ্রান্ত। হযরত ইবনে আতা বলেন ঃ গৌরবের আসন একমাত্র সচ্চরিত্রতা দ্বারাই অর্জিত হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ছাড়া কেউ সচ্চরিত্রতায় পূর্ণতা অর্জন করতে পারে না। চরিত্রে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল তারাই যারা এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পদাংক অনুসরণ করে চলে।

সচ্চরিত্রতা ও অসচ্চরিত্রতার স্বরূপ

সচ্চরিত্রতা সম্পর্কে এ পর্যন্ত অনেকেই অনেক কিছু লেখেছেন; কিন্তু এর স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে সকলেই নীরব। কেবল এর ফলাফল ও পরিণতি লিখিত হয়েছে, তাও পূর্ণ মাত্রায় নয়; বরং যার যা বুঝে এসেছে, তাই লেখেছেন। তার সংজ্ঞা, স্বরূপ ও ফলাফল বিস্তারিতভাবে কেউ লিপিবদ্ধ করেননি। আমরা এখানে সে সবের কিছু উদ্ধৃত করছি।

হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ সচ্চরিত্রতা হচ্ছে মনখোলা থাকা, অর্থসম্পদ ব্যয় করা এবং কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা। ওয়াসেতী বলেন ঃ দরিদ্রতায় ও ধনাঢ্যতায় মানুষকে সন্তুষ্ট রাখা। শাহ কিরিয়ানী বলেন ঃ কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা এবং কষ্ট সহ্য করা।

আবু ওসমান বলেন ঃ উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি। সহল তস্তরীকে সচ্চরিত্রতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে সহনশীল হওয়া এবং প্রতিশোধ না নেয়া; বরং যালেমের প্রতি দয়া ও অনুকম্পা করা এবং তার জন্যে মাগফেরাত কামনা করা। তাঁর অপর উক্তি এই ঃ রিযিকের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার প্রতি কুধারণা না করা, তাঁর উপর ভরসা করা এবং যে বিষয়ের তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পূর্ণ হয়ে গেলে চুপ থাকা; তাঁর হক ও বান্দার হকে তাঁর নাফরমানী না করা; বরং আনুগত্য করা। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ সচ্চরিত্রতা তিনটি বিষয়ের মধ্যে নিহিত; হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা, হালাল রুজি অন্বেষণ করা এবং পরিজনের উপর অধিক ব্যয় না করা। আবু সাঈদ খেরায বলেন ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুর দিকে প্রত্যাশী না হওয়ার নাম সচ্চরিত্রতা। এমনি ধরনের আরও অনেক উক্তির মধ্যে কেবল সচ্চরিত্রতার ফলাফল উল্লিখিত হয়েছে এবং স্বয়ং সচ্চরিত্রতার স্বরূপ বর্ণিত হয়নি। তাই এক্ষণে আমরা এর স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করছি।

জানা উচিত, আরবীতে 'খালক' ও 'খুল্ক'– এ দু'টি শব্দ পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়। বলা হয়, অমুক ব্যক্তির খালক ও খুলক উভয়টি ভাল। অর্থাৎ, সে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় সৌন্দর্যের অধিকারী। সুতরাং জানা গেল, 'খাল্ক' বলে বাহ্যিক আকৃতি এবং 'খুলক' বলে অভ্যন্তরীণ আকৃতি বুঝানো হয়। কেননা, মানুষ দু'টি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত। একটি দেহ, যা চোখে দেখা যায় এবং অপরটি আত্মা অর্থাৎ, নফস, যা অন্তর্দৃষ্টি ও বিবেক দ্বারা জানা যায়। এতদুভয়ের প্রত্যেকটির একটি আকৃতি আছে– ভাল হোক অথবা মন্দ। যে নফস বিবেকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, তার মান-মর্যাদা দেহের তুলনায় বেশী। এ কারণেই আল্লাহ্ তাআলাও একে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন, যাতে এর মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। আল্লাহ বলেন ঃ

انی خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحی فقعوا له سجدين ـ

অর্থাৎ, আমি একটি মাটির মানুষ সৃষ্টি করব। অতঃপর যখন তাকে সঠিকভাবে বানিয়ে দেই এবং তার মধ্যে আমার আত্মা ফুঁকে দেই, তখন তোমরা (হে ফেরেশতাকুল) তার উদ্দেশে সেজদায় লুটিয়ে পড়।

এই আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, দেহ সম্বন্ধযুক্ত মাটির সাথে এবং

রূহ তথা আত্মা সম্বন্ধযুক্ত আল্লাহ্ তাআলার সাথে। এখানে রূহ্ ও নফ্স একই বস্তু।

মোট কথা, 'খুলক' (চরিত্র) শব্দের সংজ্ঞা, খুল্ক নফসের মধ্যে বদ্ধমূল একটি প্রকৃতির নাম, যদ্দ্বারা ক্রিয়াকর্ম অনায়াসে ও চিন্তাভাবনা ব্যতিরেকে প্রকাশ পায়। এই প্রকৃতি দ্বারা প্রকাশিত ক্রিয়াকর্ম যদি বিবেক ও শরীয়তের দৃষ্টিতে উৎকৃষ্ট হয়, তবে সেই প্রকৃতিকে বলা হয় সচ্চরিত্রতা। পক্ষান্তরে যদি তা দ্বারা মন্দ ক্রিয়াকর্ম প্রকাশ পায়, তবে তার নাম হয় অসচ্চরিত্রতা। এখানে "নফসের মধ্যে বদ্ধমূল" বলার কারণ, যদি কোন ব্যক্তি ঘটনাচক্রে কোন প্রয়োজনে অগাধ ধনরাশি ব্যয় করে দেয়, তবে একে দানশীলতারূপী সচ্চরিত্রতা বলা হবে না, যে পর্যন্ত এটা তার অন্তরের বদ্ধমূল অভ্যাস না হয়। ক্রিয়াকর্ম প্রকাশ পাওয়ার ক্ষেত্রে "চিন্তাভাবনা ব্যতিরেকে" কথাটি যোগ করার কারণ, যদি কেউ অনেক চিন্তাভাবনার পর প্রয়াস সহকারে অর্থ ব্যয় করে অথবা আপন ক্রোধকে দমন করে, তবে একে দানশীলতা ও সহনশীলতার চরিত্র বলা হবে না। মোট কথা, এখানে চারটি বিষয় জরুরী। (১) ভাল অথবা মন্দ ক্রিয়াকর্ম, (২) তাতে সক্ষমতা, (৩) তাকে চেনা এবং (৪) নফসের মধ্যে এমন আকৃতি থাকা, যদ্দ্বারা ভাল অথবা মন্দের মধ্য থেকে একটি সহজ হয়ে যায়। সুতরাং শুধু ক্রিয়াকর্মকে চরিত্র বলা হবে না। কেননা, অনেক মানুষের মধ্যে দানশীলতার চরিত্র আছে; কিন্তু নিঃস্বতা অথবা অন্য কোন কারণে দান করতে পারে না। কিংবা কতক লোকের মধ্যে কৃপণতার চরিত্র আছে, কিন্তু লোক দেখানোর উদ্দেশে দান করে। সক্ষমতার নামও চরিত্র নয়। কেননা, সক্ষমতার সম্বন্ধ দানশীলতা ও কৃপণতার সাথে সমান এবং প্রত্যেক মানুষ স্বভাবগতভাবে দানশীলতা ও কৃপণতার ক্ষমতা রাখে। এতে জরুরী হয় না যে, তার মধ্যে কৃপণতা ও দানশীলতার চরিত্র আছে। কেবল চেনাও চরিত্র নয়। কেননা, চেনাও সক্ষমতার ন্যায় ভাল মন্দ উভয়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে। চতুর্থ বিষয় অর্থাৎ, যে আকৃতি দ্বারা নফস ভাল ও মন্দ ক্রিয়াকর্মের জন্যে তৎপর হয় তারই নাম চরিত্র। বাহ্যিক সৌন্দর্য যেমন শুধু একটি অঙ্গ– উদাহরণতঃ নেত্রদ্বয় সুন্দর হলেই পূর্ণাঙ্গ হয় না; বরং নাক, মুখ, গণ্ড সবগুলো সুশ্রী হলে বাহ্যিক সৌন্দর্য পূর্ণ হয়; তেমনি অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের জন্যে চারটি বিষয় রয়েছে। এগুলো সুন্দর হলে সচ্চরিত্রতা পূর্ণাঙ্গ হবে। অর্থাৎ কারও মধ্যে যখন এ চারটি বিষয় সমতার পর্যায়ে সুসমন্বিত থাকবে, তখন তাকে সচ্চরিত্র বলা হবে। এ চারটি বিষয় হচ্ছে জ্ঞানশক্তি, ক্রোধশক্তি, কামশক্তি ও সমতাশক্তি।

অর্থাৎ, প্রথমোক্ত তিনটি বিষয়কে সমতার পর্যায়ে রাখার ক্ষমতা। জ্ঞানশক্তির উপকারিতা হচ্ছে, মানুষ এর মাধ্যমে কথাবার্তায় সত্য, মিথ্যা, বিশ্বাসে হক ও বাতিল এবং কাজে, কর্মে ভাল ও মন্দ জেনে নেয়। জ্ঞানশক্তি এরূপ হয়ে গেলে তার ফলস্বরূপ প্রজ্ঞা অর্জিত হয়, যা সকল সচ্চরিত্রতার মূল এবং যার সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

ومن يؤت الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا -

অর্থাৎ, যে প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, সে প্রভূত কল্যাণপ্রাপ্ত হয়।

আর ক্রোধশক্তি এবং কামশক্তির ফায়দা হচ্ছে ক্রোধ ও কাম উভয়টি প্রজ্ঞা অনুযায়ী হবে এবং প্রজ্ঞার ইশারায় পরিচালিত হবে। অর্থাৎ, বুদ্ধি ও শরীয়ত যা পছন্দ করে, তেমনই আমল করবে। সমতাশক্তির উদ্দেশ্যও তাই, অর্থাৎ,. ক্রোধ ও কামকে বুদ্ধি ও শরীয়তের অনুসারী করে দেয়ার ক্ষমতা হবে।

যে ব্যক্তির মধ্যে উপরোক্ত চারটি বিষয় সমতার পর্যায়ে বিদ্যমান থাকবে, তাকে সর্বাবস্থায় সচ্চরিত্র বলা হবে। যার মধ্যে কেবল একটি বিষয় অথবা দু'টি বিষয় থাকবে, তাকে সেদিক দিয়েই চরিত্রবান বলা হবে, যেমন মুখমণ্ডলের কোন কোন অংশ সুশ্রী হলে সেই অংশকেই সুশ্রী বলা হয়, সম্পূর্ণ মুখমণ্ডলকে সুশ্রী বলা হয় না। ক্রোধশক্তির সমতার পর্যায়কে বলা হয় বীরত্ব এবং কামশক্তির সমতার পর্যায়কে বলা হয় সাধুতা। এ দু'টি পর্যায়ই প্রশংসনীয়। এতে কমবেশী নিন্দনীয়।

জানা দরকার, জ্ঞানশক্তির সমতা দ্বারা সুপরিচালন ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ মেধা, বিশুদ্ধ অভিমত, সূক্ষ্ম আমল ও নফসের গোপন আপদ সম্পর্কিত জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। এর বাহুল্য দ্বারা ধোকা, প্রতারণা ও বিদ্বেষ জন্মলাভ করে। এর স্বল্পতা দ্বারা অনভিজ্ঞতা, অচেতনতা, নির্বুদ্ধিতা ও উন্মাদনা অস্তিত্ব লাভ করে। ক্রোধশক্তির সমতা অর্থাৎ, বীরত্ব থেকে যে যে গুণের সৃষ্টি হয়, সেগুলো হচ্ছে– দয়া, সাহসিকতা, ঔদার্য, বিনয়, সহনশীলতা, ক্রোধ দমন, গাম্ভীর্য ইত্যাদি। এর বাহুল্য থেকে অহংকার, আস্ফালন, রাগে অগ্নিশর্মা হওয়া, অহমিকা ইত্যাদি স্বভাব জন্মলাভ করে এবং এর স্বল্পতা থেকে ভীরুতা, অপমান, লাঞ্ছনা, ভয়, জরুরী কাজে সংকুচিত হওয়া ইত্যাদি। দোষ প্রকাশ পায়। কামশক্তির সমতা অর্থাৎ, সাধুতা থেকে সৃষ্ট গুণাবলী এই ঃ দানশীলতা, লজ্জাশীলতা, সবর, অল্পে তুষ্টি, পরহেযগারী, নির্লোভ হওয়া ইত্যাদি এর স্বল্পতা ও বাহুল্য থেকে সৃষ্ট স্বভাবগুলো এই ঃ লালসা, নির্লজ্জতা, অপব্যয়, পরিজনের জন্যে কম ব্যয়

করা, বেইয্যতী, অশ্লীলতা, অনর্থক খোশামোদ, হিংসা, অপরের দুঃখে হাসা, ধনীদের মধ্যে লাঞ্ছিত হওয়া, ফকীরদেরকে হেয় মনে করা ইত্যাদি। মোট কথা, উপরোক্ত প্রজ্ঞা, বীরত্ব, সাধুতা ও মিতাচার,– এ চারটি বিষয় হচ্ছে চরিত্র মাধুর্যের মূল। অবশিষ্ট সবগুলো এসবের শাখা-প্রশাখা। এ চারটি বিষয়েরই পূর্ণ সমতার পর্যায় রসূলে আকরাম (সাঃ) ছাড়া অপর কারও নছীব হয়নি। তাঁর পরে সকল মানুষের মধ্যে পার্থক্য আছে। যে ব্যক্তি এসব চরিত্রে তাঁর যত বেশী নিকটবর্তী, সে সেই পরিমাণে আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী। আর যে দূরবর্তী, সে দূরবর্তী। যে ব্যক্তির মধ্যে সবগুলো চরিত্র বিদ্যমান, সে এ বিষয়ের যোগ্য যে, সকল মানুষ তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে এবং তার আনুগত্য ও অনুসরণ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসব বিশেষণে বিশেষিত নয়; বরং এগুলোর বিপরীত বিশেষণে বিশেষিত, সে এ বিষয়ের যোগ্য যে, তাকে জনবসতি থেকে বের করে দেয়া হবে। কেননা, সে বিতাড়িত শয়তানের নিকটবর্তী।

কোরআন মজীদেও মুমিনদের গুণাবলীতে উপরোক্ত চরিত্রসমূহের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ -

অর্থাৎ, মুমিন তারাই, যারা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, এর পর সন্দেহ করেনি এবং আল্লাহর পথে ধনসম্পদ ও প্রাণের বিনিময়ে জেহাদ করেছে। তারাই সাচ্চা।

আল্লাহ ও রসূলের প্রতি সন্দেহাতীতরূপে বিশ্বাস স্থাপন করা বিশ্বাসশক্তির মাধ্যমে হয়, যা বুদ্ধির ফল ও প্রজ্ঞার চরম পরিণতি। ধনসম্পদের বিনিময়ে জেহাদ করা দানশীলতা, যা কামশক্তিকে বাধা দেয়ার মাধ্যমে হয়। প্রাণের বিনিময়ে জেহাদ হচ্ছে বীরত্ব, যা ক্রোধশক্তিকে সমতার পর্যায়ে ব্যবহার করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসায় বলা হয়েছে–

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

অর্থাৎ, তারা কাফেরদের প্রতি বজ্রকঠোর এবং পরস্পরে দয়াশীল।

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, কঠোরতা ও দয়া পৃথক পৃথক পাত্রে হয়। সুতরাং না সর্বক্ষেত্রে কঠোরতা করা পূর্ণতা, না সর্বক্ষেত্রে দয়া।

সাধনা দ্বারা চরিত্রের পরিবর্তন হওয়া না হওয়া

যাদের উপর বাতিল বিশ্বাসের প্রধান্য রয়েছে, তাদের জন্যে আত্মশুদ্ধির উদ্দেশে অধ্যবসায় ও সাধনা করা কঠিন। এই শ্রেণীর লোকেরা বলে যে, চরিত্রে পরিবর্তন হতেই পারে না। তারা এই দাবীর দুটি কারণ বর্ণনা করে থাকে। প্রথম হচ্ছে, অভ্যন্তরীণ আকৃতির নাম হচ্ছে 'খুল্‌ক' তথা চরিত্র। যেমন বাহ্যিক আকৃতিকে বলা হয় 'খাল্‌ক'। কিন্তু বাহ্যিক আকৃতিতে পরিবর্তন সম্ভবপর নয়। উদাহরণতঃ বেঁটে ব্যক্তি তার দৈহিক উচ্চতা বাড়াতে পারে না এবং দীর্ঘদেহী ব্যক্তি বেঁটে হতে পারে না। তেমনি কুশ্রী ব্যক্তি সুশ্রী এবং সুশ্রী কুশ্রী হতে পারে না। সুতরাং অভ্যন্তরীণ দোষকে এমনি মনে করে নেয়া উচিত। দ্বিতীয় কারণ, সচ্চরিত্রতার উদ্দেশ্য হচ্ছে কাম ও ক্রোধের মূলোৎপাটন। দীর্ঘ সাধনা দ্বারা জানা গেছে, এগুলোর মূলোৎপাটন কখনও হয় না। কারণ, এগুলো হচ্ছে মেযাজ ও স্বভাবের দাবী। সুতরাং সাধনার পেছনে পড়া নিষ্ফল ও জীবনকে বিনষ্ট করার নামান্তর। এক্ষণে আমরা এ দু'টি কারণের জওয়াব লিপিবদ্ধ করছি।

যদি চরিত্রে পরিবর্তন না হত, তবে ওয়ায, নসীহত, শাসন ইত্যাদি সমস্তই পন্ডশ্রম হত এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) কেন বলতেন যে حَسِّنُوْا أَخْلَاقَكُمْ –তোমরা তোমাদের চরিত্র সুন্দর কর? মানুষ তো দূরের কথা, এই পরিবর্তন জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও সম্ভবপর। দেখ, বাজপাখীর পলায়নী স্বভাব কিরূপে মেলামেশায় পরিবর্তিত হয়ে যায়? তালীমের প্রভাবে শিকারী কুকুর কেমন সুশিক্ষিত হয়ে যায়? সে শিকারকে শুধু ধরে ফেলে, লোভ মোটেই করে না। অবাধ্য ঘোড়া সহিসের কেমন অনুগত ও বাধ্য হয়ে যায়। এগুলো চরিত্রের পরিবর্তন নয় তো কি? এক্ষেত্রে মূল কথা হচ্ছে, অস্তিত্ব জগতের কতক বস্তু এমন, যেগুলোর অস্তিত্ব পূর্ণাঙ্গ। তাতে যে যে বিষয়ের প্রয়োজন ছিল, তা পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন মানুষের ইচ্ছায় তাতে কোন পরিবর্তন হতে পারে না। যেমন আকাশ, নক্ষত্র ও মানুষ এবং জীবজন্তুর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আর কতক বস্তু এমন, যার অস্তিত্ব অসম্পূর্ণ, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ হওয়ার যোগ্যতা তার মধ্যে নিহিত আছে। পূর্ণতার শর্তাদি পাওয়া গেলে সে পূর্ণতার স্তরে পৌঁছতে পারে। এসব শর্ত কখনও মানুষের ইচ্ছাধীন থাকে। উদাহরণতঃ আমের

আঁটি ফলও নয়, বৃক্ষও নয়; কিন্তু এমনভাবে সৃজিত যে, মামুলী পরিচর্যা করলে তা বৃক্ষ হতে পারে। যখন আঁটি বান্দার ইচ্ছা দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, তখন ক্রোধ ও কাম পরিবর্তিত হয়ে গেলে তা অবান্তর হবে কেন? তবে মোটেই কোন প্রভাব থাকবে না– এভাবে মূল্যেৎপাটন করা আমাদের সাধ্যাতীত। কিন্তু এগুলোকে দাবিয়ে রাখা এবং অধ্যবসায় ও সাধনা দ্বারা বশে রাখা সম্ভবপর। আমাদের প্রতি আদেশও তাই এবং এটাই আমাদের মুক্তি ও আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার উপায়। হাঁ, মানুষের স্বভাব বিভিন্নরূপ। কতক স্বভাব দ্রুত প্রভাবিত হয় এবং কতক বিলম্বে। স্বভাবের বিভিন্নতার কারণ দুটি। এক, যাকে পরিবর্তন করা উদ্দেশ্য, জন্মের গোড়া থেকে স্বভাবের সাথে তার জড়িত থাকা। উদাহরণতঃ কাম, ক্রোধ ও অহংকার প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বিদ্যমান আছে। কিন্তু কামকে পরিবর্তন করা সর্বাধিক কঠিন। কেননা, এটা জন্মের গোড়া থেকে মানুষের সাথে রয়েছে। সেমতে শৈশব থেকে শিশুর খাহেশ হয়। ক্রোধ প্রায়শ সাত বছর বয়সে সৃষ্টি হয়। এর পর বিচারশক্তি প্রদত্ত হয়। দ্বিতীয় কারণ, স্বভাব কখনও অধিক কর্ম দ্বারাও মযবুত হয়। মানুষ স্বভাব অনুযায়ী কাজ করে এবং একেই পছন্দনীয় ও উৎকৃষ্ট মনে করে। এক্ষেত্রে মানুষের চারটি স্তর রয়েছে। প্রথম হচ্ছে, মানুষ যেমন জন্মগ্রহণ করে, তেমনি থেকে যায় এবং সত্য-মিথ্যা ও ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে পারে না। সকল বিশ্বাস থেকে গাফেল ও মুক্ত। এমন মানুষের চিকিৎসা দ্রুত সম্ভবপর। তার জন্যে কেবল একজন ওস্তাদ ও মুর্শিদ প্রয়োজন হয়। মনের মধ্যে সাধনার প্রেরণা থাকলে অল্প দিনের মধ্যে তার চরিত্র সংশোধিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় স্তর এমন মানুষ, যে মন্দ কাজের জ্ঞান তো রাখে, কিন্তু সৎকর্মে অভ্যস্ত নয়। মন্দ কাজকেই ভাল মনে করে। এ ব্যাপারে সে তার খাহেশের অনুসারী এবং বিশুদ্ধ মতের প্রতি বিমুখ। এতদসত্ত্বেও আপন কর্মের ত্রুটি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। এরূপ ব্যক্তির সৎপথে আসা প্রথম স্তরের তুলনায় কঠিন। কেননা, এতে দুটি বিষয়ের প্রয়োজন হবে– এক, কুকর্ম ত্যাগ করানো এবং দুই, সৎকর্মের অভ্যাস গড়ে তোলা। মোট কথা, এরূপ ব্যক্তি সাধনায় বিশেষভাবে তৎপর হলে প্রভাবিত হতে পারে। তৃতীয় স্তর এমন মানুষ, যে বিশ্বাস করে যে, চরিত্রহীনতার কাজ খুব ভাল এবং তা করা ওয়াজিব। তার লালন-পালনও চরিত্রহীনতার উপর হয়। এরূপ ব্যক্তির চিকিৎসা প্রায় অসম্ভব। তার সংশোধনের আশা নেই। কেননা, এখানে গোমরাহীর কারণ অনেক। চতুর্থ স্তর এমন মানুষ, যে কুকর্মে লালিত-পালিত হওয়ার সাথে সাথে অনেক মন্দ কাজ করা এবং মানুষের

ধ্বংস সাধন করাকে শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবের কাজ মনে করে। এ স্তরটি সর্বাধিক গুরুতর। উপরোক্ত স্তর চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম স্তর হচ্ছে নির্ভেজাল মূর্খ, দ্বিতীয় স্তর গোমরাহ মূর্খ, তৃতীয় স্তর মূর্খ ও গোমরাহ ফাসেক এবং চতুর্থ স্তর মূর্খ, গোমরাহ, ফাসেক ও দুর্মতি।

এখন দ্বিতীয় কারণের জওয়াব শুনুন। তাদের উক্তি হচ্ছে, সচ্চরিত্রতার দ্বারা কাম ও ক্রোধের মূলোৎপাটন উদ্দেশ্য। মানুষের মধ্যে এটা অসম্ভব। বাস্তব সত্য হল, মূলোৎপাটন উদ্দেশ্য নয়; বরং কাম-ক্রোধও মানুষের উপকারের জন্যে সৃজিত হয়েছে। মানব চরিত্রে এগুলো থাকাও জরুরী। যদি মানুষের মধ্যে আহারের খাহেশ না থাকে, তবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। অথবা যদি সহবাসের খাহেশ না থাকে, তবে বংশবিস্তার ব্যাহত হবে। অনুরূপভাবে ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেলে ধ্বংসাত্মক বস্তুসমূহকে প্রতিহত করতে পারবে না। ফলে মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। মোট কথা, কাম ও ক্রোধের মূলোৎপাটন উদ্দেশ্য নয়; বরং স্বল্পতা ও বাহুল্য বর্জন করে এগুলোকে সমতার পর্যায়ে রাখাই লক্ষ্য। কোন মানুষ কাম ও ক্রোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ার দাবী করতে পারে না। কেননা, পয়গম্বরগণও এগুলো থেকে মুক্ত ছিলেন না। হাদীসে আছে ঃ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ –আমি তো মানুষ বৈ নই। মানুষ যেমন রাগ করে, আমিও তেমনি রাগ করি।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে মরযীর খেলাফ কোন কিছু বর্ণিত হলে রাগে তাঁর গণ্ডদেশ লাল হয়ে যেত, কিন্তু তখনও সত্য কথাই বলতেন। ক্রোধও তাঁকে সত্যের গণ্ডির বাইরে যেতে দিত না। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ –এতে এমন লোকদের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা রাগ করে, কিন্তু রাগকে দাবিয়ে রাখে। একথা নাই যে, তারা রাগই করে না। এ থেকে জানা গেল, কাম ও ক্রোধের সমতার পর্যায়ে আসা সম্ভবপর। চরিত্রের পরিবর্তন দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য তাই। পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার আলোকে এ বিষয়টি সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত। চরিত্রের মধ্যে স্বল্পতা ও বাহুল্যের স্তর উদ্দেশ্য নয়, বরং মধ্যবর্তী স্তর কাম্য। এ বিষয়ের প্রমাণ নিম্নোক্ত আয়াত–

وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ـ

–তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না এবং কৃপণতা করে

না; বরং মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করে।

এতে দানশীলতার প্রতি ইঙ্গিত আছে, যা অপব্যয় ও কৃপণতার মধ্যবর্তী স্তর। আরও বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً إِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ـ

অর্থাৎ, তোমার হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখ না এবং তাকে পুরাপুরি প্রসারিতও করো না।

অনুরূপভাবে খানাপিনার খাহেশে সমতা কাম্য লালসা ও অনীহা অপছন্দনীয়। আল্লাহ বলেন ঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ـ

অর্থাৎ, খাও, পান কর– অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।

হাদীসে বলা হয়েছে– خَيْرُ الْأُمُوْرِ أَوْسَطُهَا –সব ব্যাপারে মধ্যবর্তী স্তরই উত্তম।

সচ্চরিত্রতা কিরূপে অর্জিত হয়?

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, সচ্চরিত্রতার উদ্দেশ্য হচ্ছে বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, কামশক্তি ও ক্রোধশক্তির সমতা এবং এগুলো শরীয়তের অনুগত হওয়া। এ বিষয়টি দুই উপায়ে অর্জিত হয়। প্রথম, আল্লাহ তাআলার দান হিসেবে। অর্থাৎ, জন্মলগ্ন থেকে মানুষ পূর্ণ জ্ঞানী ও চরিত্রবান হবে। কাম ও ক্রোধ তার উপর প্রবল হবে না; বরং উভয়টি শরীয়তের অনুগত থাকবে। এরূপ ব্যক্তি তালীম ছাড়াই আলেম হয়ে যায়। যেমন হযরত ঈসা (আঃ), হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) ও পয়গম্বরকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। উপার্জনের মাধ্যমে অর্জিত হয়, এমন বিষয় মানুষের সৃষ্টি ও প্রকৃতিতে থাকা অবান্তর নয়। অধিকাংশ শিশু শুরু থেকেই দাতা, নির্ভীক ও স্পষ্টভাষীরূপে জন্ম গ্রহণ করে। কতক এর বিপরীত হয়, কিন্তু অন্যদের সাথে মেলামেশায় এটা তাদের করায়ত্ত হয়ে যায়। আবার কখনও শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

দ্বিতীয় উপায়– অধ্যবসায় ও সাধনার মাধ্যমে চরিত্র অর্জন করা। অর্থাৎ নফসকে এমন কাজে নিয়োজিত করা, যদ্দ্বারা চরিত্রের প্রার্থিত বিষয় হাসিল হয়ে যায়। উদাহরণতঃ যে ব্যক্তি দানশীলতার চরিত্র অর্জন করতে চায়, সে কষ্ট সহকারে দানশীলদের কাজ অর্থাৎ অর্থ ব্যয় অবলম্বন

করবে এবং মনের উপর জোর দিয়ে সব সময় এ কাজ করতে থাকবে। অবশেষে এটা তার অভ্যাসে পরিণত হবে। ফলে সে দানশীল হয়ে যাবে। শরীয়তের উৎকৃষ্ট চরিত্রাবলী এমনিভাবে অর্জিত হতে পারে। এর চূড়ান্ত হচ্ছে, এ কাজে সংশিষ্ট আনন্দ অনুভব করবে। উদাহরণতঃ দানশীল তাকেই বলা হবে, যে অর্থব্যয় করে আনন্দ অনুভব করে। হাদীসে আছে ঃ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلٰوةِ –নামাযে আমার চোখের শীতলতা নিহিত আছে। যে পর্যন্ত এবাদত ও নিষিদ্ধ কাজ বর্জন খারাপ মনে হবে এবং নফস কঠিন মনে করবে, সে পর্যন্ত ত্রুটি থেকে যাবে, পূর্ণ সৌভাগ্য অর্জিত হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ –নিশ্চয় এটা কঠিন, কিন্তু বিনয়ীদের জন্যে কঠিন নয়। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

اُعْبُدِ اللّٰهَ فِي الرِّضَاءِ فَاِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَفِي الصَّبْرِ عَلٰى مَا تَكْرَهُ خَيْرٌ كَثِيْرٌ

অর্থাৎ, আল্লাহর এবাদত সন্তুষ্টির অবস্থায় কর। যদি সক্ষম না হও, তবে অসহনীয় বিষয়ে সবর করার মধ্যে অনেক বরকত আছে।

উপস্থিত সৌভাগ্য অর্জিত হওয়ার জন্যে এটা যথেষ্ট নয় যে, কখনও এবাদতে মজা পাবে ও অবাধ্যতা খারাপ মনে হবে এবং কখনও হবে না; বরং মজা পাওয়া ও অবাধ্যতা খারাপ মনে হওয়া আজীবন অব্যাহত থাকতে হবে। এর পর বয়স যতই বাড়বে, এই সৌভাগ্য অধিক দৃঢ় হবে। এ কারণেই রসূলে করীম (সাঃ)-কে যখন প্রশ্ন করা হল, সৌভাগ্য কি? তখনও তিনি বললেন ঃ

طُوْلُ الْعُمُرِ فِي طَاعَةِ اللّٰهِ –অর্থাৎ, আল্লাহর আনুগত্যে দীর্ঘজীবী হওয়া।

এদিক দিয়েই নবীগণ ও ওলীগণ মৃত্যুকে খারাপ মনে করতেন। কেননা, দুনিয়া আখেরাতের কৃষিক্ষেত্র। সুতরাং দীর্ঘ জীবনের কারণে এবাদত যত বেশী হবে, ততই সওয়াব বেশী হবে এবং নফস পবিত্র ও পবিত্রতম হবে। এছাড়া এবাদতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, অন্তরের উপর তার প্রভাব হওয়া। এই প্রভাব তখনই হবে, যখন এবাদত অধিক দীর্ঘ ও অধিক স্থায়ী হয়। এখন জানা দরকার, চরিত্র দ্বারা উদ্দেশ্য নফস থেকে জাগতিক মহব্বত দূর হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহর মহব্বত তাতে প্রতিষ্ঠিত

হওয়া, এমনকি তার কাছে আল্লাহর দীদার অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোন কিছু না থাকা। সেমতে ধন-সম্পদও এমন বিষয়ে ব্যয় করবে, যদ্দ্বারা এই উদ্দেশ্য হাসিল হয় এবং কাম ক্রোধকেও এমনভাবে কাজে লাগাবে, যাতে আল্লাহকে পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য, এটা তখন হবে, যখন এসব কাজ শরীয়ত ও বিবেক অনুযায়ী সম্পাদিত হয়, এর পর এ ধরনের কাজে মজাও পায়। যদি কেউ নামাযে শান্তি ও চোখের শীতলতা পায় কিংবা এবাদত সুখকর মনে হতে থাকে, তবে এটা মোটেই অবান্তর নয়। অভ্যাসের কারণে নফসের মধ্যে এর চেয়েও অধিক আশ্চর্যজনক ব্যাপার সংঘটিত হয়ে থাকে। দেখ, নিঃস্ব জুয়াড়ি জুয়া খেলে কেমন আনন্দ পায়! অথচ যে অবস্থায় সে পতিত তাতে যদি অন্যরা পতিত হয়, তবে জুয়া ছাড়াই জীবন অসহনীয় হয়ে যাবে। জুয়ার কারণে ধনসম্পদ বিনষ্ট হয়, পরিবারে বিশৃংখলা দেখা দেয়, এর পরও জুয়ার প্রতি ভালবাসা ও টান লেগেই থাকে। চোর-পকেটমারদের উপর কেমন বেত্রাঘাত বর্ষিত হয়, হাত কাটা হয়; কিন্তু তারা একে গর্বের বিষয় মনে করে এবং কঠোর শাস্তি ভোগ করে আনন্দিত হয়। এমনকি, তাদের দেহ কেটে খন্ড খন্ড করা হলেও তারা চোরাই মালের সন্ধান দেয় না এবং সঙ্গী চোরদের নাম বলে না। এটা এ কারণেই যে, তারা তাদের কাজকে বাহাদুরীর চরমোৎকর্ষ বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে। সুতরাং অভ্যাসের কারণে বাতিল বিষয়ে এমন আনন্দ পাওয়া গেলে সত্য বিষয়ে দীর্ঘ দিন অভ্যাস করলে তাতে আনন্দ পাওয়া যাবে না কেন?

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে নিশ্চিতরূপে জানা গেল যে, সাধনার মাধ্যমে সচ্চরিত্রতা অর্জিত হতে পারে। অর্থাৎ, প্রথমে মনের উপর জোর দিয়ে এসব কাজ করলে অবশেষে তা স্বভাবগত ও মজ্জাগত বিষয়ে পরিণত হয়। উদাহরণতঃ যদি কোন ব্যক্তি 'ফকীহ' হতে চায়, তবে প্রথমে সে ফকীহদের ক্রিয়াকর্ম যথারীতি অনুশীলন করবে। অর্থাৎ ফেকাহ্ শাস্ত্রের মাসআলাসমূহ বার বার মুখে উচ্চারণ করবে; যাতে অন্তরের উপর ফেকাহর প্রভাব প্রতিফলিত হয়। এটা হয়ে গেলে সে ফকীহ্ হয়ে যাবে। এমনিভাবে যে দানশীল, সাধু, সহনশীল ও বিনম্র হতে চায়, তার উচিত শুরুতে এহেন লোকদের ক্রিয়াকর্ম মনের উপর জোর দিয়ে সম্পন্ন করা, যাতে আস্তে আস্তে এসব কাজ তার স্বভাবে স্থান করে নেয়। এটা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। ফেকাহ্র অন্বেষী ব্যক্তি যেমন একদিন অনুশীলন বন্ধ রাখলে ফেকাহ থেকে বঞ্চিত হয় না এবং একদিনের অনুশীলন দ্বারা ফকীহ হয়ে যায় না, তেমনি যেব্যক্তি সৎকর্ম দ্বারা আত্মশুদ্ধি চায়, সে

একদিনের এবাদত দ্বারা এই মর্তবা পেতে পারে না এবং একদিনের অবাধ্যতা দ্বারা এই মর্তবা থেকে বঞ্চিত হতে পারে না। একটি কবীরা গোনাহ্ চিরন্তন দুর্ভাগ্যের কারণ হয় না– বুযুর্গগণের এই উক্তির অর্থ তাই। হাঁ, একদিনকে কর্মহীন রাখা দ্বিতীয় দিনকে কর্মহীন রাখার কারণ হয়। এর পর ক্রমে ক্রমে মন অলসতায় অভ্যস্ত হয়ে একদিন আরব্ধ কর্মই পরিত্যাগ করে বসে। অনুরূপভাবে একট সগীরা গোনাহ্ করলে সে আরেকটি সগীরা গোনাহকে টেনে আনে। সুতরাং একদিনের বন্ধকে তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়।

চরিত্র সংশোধনের উপায়

জানা উচিত যে, মনের চিকিৎসা দেহের চিকিৎসার অনুরূপ। অধিকাংশ দেহ সুস্থ ও সমতাবিশিষ্টই হয়ে থাকে। এর পর খাদ্য ও অন্যান্য কারণে পাকস্থলীতে ত্রুটি দেখা দেয় এবং দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে মনও বিশুদ্ধ এবং সমতাসম্পন্ন হয়ে থাকে। এর পর বাইরের প্রভাব দ্বারা তা কলুষিত হয়। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاِنَّمَا اَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ -

–প্রত্যেক শিশু মূল ঈমানের উপর জন্মগ্রহণ করে, এর পর তার পিতামাতা তাকে ইহুদী, খৃস্টান অথবা অগ্নিপূজারী বানায়।

দেহ যেমন শুরুতে পূর্ণাঙ্গ হয় না; বরং লালন-পালন ও খাদ্যের সাহায্যে পূর্ণাঙ্গ হয়, তেমনি নফসও অপূর্ণ জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু পূর্ণতার যোগ্যতা তার মধ্যে থাকে। আত্মশুদ্ধি, চরিত্র সংশোধন ইত্যাদি দ্বারা পরে কামেল হয়ে যায়। দেহ সুস্থ হলে চিকিৎসক কেবল সুস্থতা অক্ষুণ্ণ রাখার উপায় করে, আর দেহ অসুস্থ হলে চিকিৎসক স্বাস্থ্য উদ্ধারে সচেষ্ট হয়। এমনিভাবে মানুষের নফস পাক সাফ হলে তাকে তেমনি রাখার চেষ্টা করা উচিত। আর যদি নফসে কোন পূর্ণতার গুণ না থাকে, তবে তা অর্জন করার ব্যাপারে চেষ্টা করতে হবে।

যে কারণে দেহের সমতা বিনষ্ট হয়, তার বিপরীত বস্তু দ্বারা দেহের চিকিৎসা করা হয়। উদাহরণতঃ উত্তাপের কারণে রোগ হলে তার চিকিৎসা শৈত্য দ্বারা করা হয়।এমনিভাবে আন্তরিক রোগের চিকিৎসাও তার বিপরীতদভ বস্তু দ্বারা হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ মূর্খতার চিকিৎসা শিক্ষা দ্বারা, কৃপণতার চিকিৎসা দানশীলতা দ্বারা এবং অহংকারের

চিকিৎসা বিনয় দ্বারা হয়। দৈহিক রোগে ওষুধের তিক্ততা সহ্য করতে হয় এবং মনে চায় এমন কুপথ্য থেকে সবর করতে হয়। এমনিভাবে আন্তরিক রোগে সাধনার তিক্ততা এবং চিকিৎসার কষ্ট বরদাশত করা দরকার; বরং এ ক্ষেত্রে কষ্ট সহ্য করার প্রয়োজন আরও বেশী। কেননা, মৃত্যু হলে দৈহিক রোগ থেকে মুক্তি হয়ে যায়; কিন্তু অন্তরের রোগ এমন যে, মৃত্যুর পরও অনন্তকাল পর্যন্ত থেকে যায়। দৈহিক রোগের চিকিৎসক যদি সকল প্রকার রোগীকে একই ওষুধ সেবন করায়, অধিকাংশ রোগী মারা যাবে। এমনিভাবে আন্তরিক রোগের চিকিৎসক মুর্শিদ ও ওস্তাদ সকল মুরীদকে একই লাঠি দিয়ে হাঁকালে তাদেরও সর্বনাশ না হয়ে গত্যন্তর নেই। মুর্শীদের উচিত মুরশীদের রোগ, অবস্থা, বয়স ও মেযাজ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে যে, তার দ্বারা কোন্ প্রকার সাধনা সম্ভবপর। এটা জানার পর মুর্শিদ তার দ্বারা সাধ্যানুযায়ী কষ্টের কাজ নেবে। উদাহরণতঃ মুরীদ মূর্খ হলে এবং শরীয়তের বিধি-বিধান না জানলে প্রথমে তাকে ওযু,নামায ও বাহ্যিক এবাদত শিক্ষা দেবে। সে হারাম ধন-সম্পদ ও গোনাহে মশগুল থাকলে তা বর্জন করার আদেশ দিবে। যখন তার বাহ্যিক অবস্থা বাহ্যিক এবাদতের অলংকারে অলংকৃত এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ্য গোনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যাবে, তখন অবস্থার ইঙ্গিতে তার অভ্যন্তরের দিকে মনোযোগ দিয়ে তার চরিত্র ও আন্তরিক রোগ পর্যবেক্ষণ করবে। যদি জানা যায় যে, তার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ রয়েছে, তবে সেগুলো খয়রাত করতে বলবে, যাতে ধন-সম্পদের চিন্তা থেকে মন মুক্ত হয়ে যায়। আর যদি মুরীদের মধ্যে ঔদ্ধত্য ও অহংকার প্রবল দেখা যায়, তবে তাকে বাজারে ভিক্ষাবৃত্তির জন্যে পাঠিয়ে দেবে। কেননা, নফসের ঔদ্ধত্য ও অহমিকা লাঞ্ছনা ছাড়া দূর হয় না। ভিক্ষার চেয়ে অধিক লাঞ্ছনার কোন কাজ নেই। অহংকার দূর না হওয়া পর্যন্ত এটা অব্যাহত রাখবে। কারণ, ঔদ্ধত্য ও অহংকার অন্তরের মারাত্মক রোগ। আর যদি মুরীদের মধ্যে দৈহিক পারিপাট্য প্রবল দেখা যায়, তবে তাকে ময়লা ও আবর্জনার জায়গায় ঝাড়ু দিতে বলবে এবং বাবুর্চিখানা ও ধোঁয়ার জায়গায় বসতে বলবে, যে পর্যন্ত তার মেযাজ থেকে পরিপাট্য হটে না যায়। কেননা, যারা পোশাক-পরিচ্ছদ পরিপাটি করে, তাদের মধ্যে ও নববধূর মধ্যে কি পার্থক্য? মানুষ তার দেহের পূজা করুক অথবা মূর্তির আরাধনা করুক– এতেও কোন তফাৎ নেই। কেননা, যখন অন্যের এবাদত হয়, তখন আল্লাহ তাআলা থেকে আড়াল সৃষ্টি হয়ে যায়। এতে আপন নফস ও প্রতিমা উভয়ই সমান। যদি

মুরীদের মধ্যে আহারের লালসা প্রবল দেখা যায়, তবে তাকে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত রোযা রাখাবে, কম খাওয়াবে এবং সুস্বাদু খাদ্য পাকিয়ে অন্যকে খাওয়াতে বলবে– নিজে খাবে না। সবরের অভ্যাস ও খাওয়ার লোভ দূর না হওয়া পর্যন্ত এটা অব্যাহত রাখবে। যদি জানা যায়, মুরীদ যুবক ও বিবাহযোগ্য; কিন্তু স্ত্রীর ভরণ-পোষণে অক্ষম, তবে তাকে রোযা রাখার আদেশ করবে। এতে খাহেশ না কমলে বলবে যে, রাতে পানি দিয়ে ইফতার কর এবং দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় খানা খাও– পানি পান করো না। এছাড়া গোশত ও তরকারী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেবে– যাতে তার নফস লাঞ্ছিত হয় এবং খাহেশ কমে যায়। কেননা, শুরুতে ক্ষুধা অপেক্ষা ভাল কোন চিকিৎসা নেই। যদি মুরীদের মধ্যে ক্রোধ প্রবল দেখা যায়, তবে সহনশীলতার আদেশ করবে এবং কোন বদমেযাজ ব্যক্তির সাথে দিয়ে তার আনুগত্য করতে বলবে। এভাবে তার নফস সহনশীলতায় অভ্যস্ত হয়ে যাবে। সেমতে কোন কোন বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁরা স্বীয় নফসকে সহনশীলতায় অভ্যস্ত এবং ক্রোধের তীব্রতা হ্রাস করার জন্যে এমন লোকদের মজুরি করতেন, যারা উঠতে বসতে গালি দিত। এভাবে তারা নফসকে সবর করতে বাধ্য করতেন এবং ক্রোধ দাবিয়ে রাখতেন। হিন্দু যোগীরা এবাদতে আলস্য দূর করার জন্যে সারারাত একই অবস্থায় দন্ডায়মান থাকে। এসব দৃষ্টান্ত থেকে অন্তরের চিকিৎসার পদ্ধতি জানা যায়। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য প্রত্যেক রোগের জন্যে আলাদা আলাদা চিকিৎসা লিপিবদ্ধ করা নয়। এটা পরে বর্ণিত হবে। এখানে উদ্দেশ্য এ কথা বলা যে, এক্ষেত্রে সাধারণ পদ্ধতি হচ্ছে নফসের খাহেশের বিরুদ্ধে চলা। কোরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা একটি মাত্র কথায় এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَأْوٰى -

–যে তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং নিজেকে খেয়ালখুশী থেকে ফিরিয়ে রাখে, জান্নাতই তার ঠিকানা।

যদি কোন ব্যক্তি খাহেশ বর্জনের সংকল্প করার পর খাহেশের উপকরণাদির সম্মুখীন হয়, তবে একে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে পরীক্ষা মনে করে নেবে। তখন উচিত হবে সবর করা এবং সংকল্পে অটল থাকা। কেননা, সংকল্প ছেড়ে দিলে নফস তাতেই অভ্যস্ত হয়ে যাবে। বরং সংকল্প ভঙ্গ করলে নিজের জন্যে একটি শাস্তি নির্দিষ্ট করে নেবে, যা

মোরাকাবা অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। শাস্তি দিয়ে সতর্ক না করলে নফস প্রবল হয়ে খাহেশ অনুযায়ী কাজ করবে। ফলে সাধনা বরবাদ হয়ে যাবে।

অন্তরের রোগ ও স্বাস্থ্যের বিবরণ

প্রকাশ থাকে যে, দেহের প্রতিটি অঙ্গ একটি বিশেষ কাজের জন্যে সৃজিত হয়েছে। যদি সেই অঙ্গ দ্বারা সেই কাজ সাধিত না হয় কিংবা অস্থিরতা সহকারে সাধিত হয়, তবে অঙ্গটিকে সুস্থ বলা হবে না। উদাহরণতঃ ধরতে না পারা হাতের রোগ এবং দেখতে না পারা কিংবা দেখা কঠিন হওয়া চোখের রোগ। অনুরূপভাবে অন্তরের রোগ তাকে বলা হবে, যার কারণে অন্তর তার বিশেষ কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম না হয়। অন্তরের বিশেষ কাজ হচ্ছে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মারেফত, মহব্বত, এবাদত এবং আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারা আনন্দ পাওয়া। এছাড়া প্রত্যেক বস্তুর খাহেশের উপর এই আনন্দকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং এরই জন্যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাছে সাহায্য চাওয়া।

আল্লাহ্ বলেন ঃ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

–আমি মানব ও জিনকে কেবল আমার এবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছি। এ থেকে জানা গেল, মানব অন্তরের বিশেষ কাজ হচ্ছে এবাদত ও আল্লাহ্‌র মারেফত। আসলে এটাই হওয়া উচিত, যাতে মানুষ চতুষ্পদ জন্তু থেকে আলাদা হয়ে যায়। কেননা, পানাহার, সহবাস ও দেখার ক্ষেত্রে মানুষ জন্তু থেকে পৃথক নয়। বরং এসব বস্তুকে মূল স্বরূপ অনুযায়ী জানার ক্ষেত্রে পৃথক। সকল বস্তুর স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা। তাই কেউ যদি সকল বস্তু চেনে এবং সৃষ্টাকে না চেনে, তবে সে কিছুই চিনল না। আল্লাহ্‌কে চেনার আলামত হচ্ছে তাঁর মহব্বত। যে আল্লাহ্‌কে চিনে নেয়, সে তাঁর মহব্বতে বিভোর হয়ে যায়। মহব্বতের চিহ্ন হচ্ছে, সে আল্লাহ্‌র উপর দুনিয়া, দুনিয়াস্থিত সবকিছু এবং আপন প্রিয় বস্তুসমূহকে অগ্রাধিকার দেবে না। আল্লাহ্ বলেন ঃ

قل ان كان اباءكم وابناءكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال ن اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومسكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوه حتى ياتى الله بامره -

–বলে দিন, যদি তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, পত্নী, সমাজ, অর্থসম্পদ, যা উপার্জন কর, ব্যবসা-বাণিজ্য, যার মন্দার ভয় কর এবং বাসভবন, যা তোমরা পছন্দ কর, তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জেহাদ করা অপেক্ষা, তবে আল্লাহ্র আদেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

সুতরাং যার কাছেই আল্লাহ্ ছাড়া অন্য বস্তু অধিক প্রিয় হয়, তার অন্তর রুগ্ন। এগুলো হচ্ছে অন্তর রোগের আলামত। এ বর্ণনা থেকে জানা গেল, সকল অন্তর রুগ্ন। তবে আল্লাহ্ যাকে রক্ষা করেছেন, তার কথা ভিন্ন। কতক রোগ এমন হয়, যা রোগী জানতে পারে না। অন্তর রোগের ক্ষেত্রেও এরূপ হয়ে থাকে। তাই মানুষ গাফেল থাকে। যদি জেনেও নেয়, তবে চিকিৎসার তিক্ততায় সবর করা কঠিন হয়। কেননা, এর চিকিৎসা হচ্ছে খাহেশের বিরোধিতা করা। নফসের মধ্যে সবর করার সামর্থ্য থাকলেও কোন বিচক্ষণ চিকিৎসক পায় না। কেননা, এ রোগের চিকিৎসক আলেম সম্প্রদায়। তারা স্বয়ং এ রোগে আক্রান্ত। সুতরাং তারা যখন নিজেদেরই চিকিৎসা করে না, তখন অপরের চিকিৎসা কিরূপে করবে? এদিক দিয়ে অন্তরের রোগ দূরারোগ্য।

এখন চিকিৎসার পর আরোগ্য লাভের আলামত শুনা উচিত। যদি চিকিৎসাধীন রোগটি কৃপণতা হয়, যা ধ্বংস ও আল্লাহ্ থেকে দূরত্বের কারণ, তবে এর চিকিৎসা ধন–সম্পদ দান ও ব্যয় দ্বারা করতে হবে। কিন্তু ধন-সম্পদ এই পরিমাণ ব্যয় করবে যেন, অপব্যয় না হয়ে যায়। নতুবা অন্য এক রোগে আক্রান্ত হয়ে যাবে। বরং মধ্যবর্তী স্তর অবলম্বন করতে হবে, যা কৃপণতা ও অপব্যয়ের প্রান্ত থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। উদাহরণতঃ যদি ধন-সম্পদ হকদারদেরকে দেয়ার তুলনায় আটকে রাখা এবং সঞ্চয় করা সহজ ও মিষ্ট মনে হয়, তবে জানতে হবে যে, কৃপণতার প্রাধান্য রয়েছে। তখন দান-খয়রাত অধিক করা দরকার। পক্ষান্তরে যদি হকদার নয়, এমন লোকদেরকে দেয়া আটকে রাখার তুলনায় সহজ ও মিষ্ট মনে হয় তবে অপব্যয় প্রবল বলে মনে করে নেবে। এমতাবস্থায় ধন-সম্পদ আটকে রাখার প্রতি মনোনিবেশ করবে। এভাবে নফসের ক্রিয়াকর্ম দেখে বুঝে নিতে থাকবে। যে পর্যন্ত অর্থের প্রতি ভ্রূক্ষেপ থেকে অন্তর বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায় এবং ব্যয় করা ও আটকে রাখা এতদুভয়ের কোনটি না করে; বরং ধনসম্পদের অবস্থা পানির মত হয়ে যায় যে, আটকে রাখলেও কোন অভাবগ্রস্তের জন্যে এবং ব্যয় করলেও অভাবগ্রস্তের জন্যেই ব্যয় করা হয়। যে অন্তর এরূপ হয়ে যাবে, সে নিশ্চিন্তে তার

পরওয়ারদেগারের সামনে যাবে। আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং সেও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। সে নৈকট্যশীল বান্দা অর্থাৎ পয়গম্বর, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণদের দলে শামিল হবে।

নিজের দোষ কিরূপে চিনা যায়?

আল্লাহ্ তা'আলা যখন কারও মঙ্গল করতে চান, তখন নিজেই তার দৃষ্টিকে তার দোষক্রটির দিকে ফিরিয়ে দেন। সুতরাং যার বোধশক্তি প্রখর হয়, তার সামনে তার দোষ গোপন থাকে না। দোষ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পর তার চিকিৎসাও সম্ভবপর হয়ে যায়। পরিতাপের বিষয়, মানুষ নিজেদের বড় বড় দোষ সম্পর্কে অজ্ঞ হলেও অপরের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দোষও জানে।

অতএব যে কেউ নিজের দোষ জানতে চায়, তার উপায় চারটি। প্রথম, যে মুর্শিদ নফসের দোষ ও গোপন বিপদ জানতে পারে, তার সামনে বসা এবং নিজেকে তার কাছে সমর্পণ করে দেয়া। এর পর যে সাধনা সে বলে দেয়, তদনুযায়ী আমল করা । মুরীদ ও মুর্শিদের পারস্পরিক সম্পর্ক হচ্ছে, মুর্শিদ মুরীদের দোষ ও প্রতিকার উভয়টি বলে দেয়। কিন্তু আজ-কাল এরূপ মুর্শিদ খুবই বিরল।

দ্বিতীয় উপায়, নিজের কোন ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী ও জ্ঞানী বন্ধুকে বলে দেবে যে, আমার অবস্থা ও ক্রিয়াকর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং আমার চরিত্র, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কাজ-কর্মের মধ্যে যে দোষ দেখ, সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত কর। প্রধান প্রধান মুসলিম মনীষীগণ তাই করতেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলতেন ঃ আল্লাহর রহমত হোক সেই ব্যক্তির প্রতি, যে আমাকে আমার দোষ সম্পর্কে অবগত করে। তিনি সালমান ফারেসী (রাঃ)-কে নিজের দোষ জিজ্ঞেস করতেন। একবার হযরত সালমান তাঁর কাছে আগমন করলে তিনি বললেন ঃ আমার সম্পর্কে এমন কোন কথা তোমার কাছে পৌঁছেছে কি, যা তোমার কাছে খারাপ মনে হয়েছে? তিনি আরজ করলেন ঃ আমাকে এ ব্যাপারে ক্ষমা করুন। এর পর হযরত ওমর পীড়াপীড়ি সহকারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি শুনেছি, আপনি দস্তরখানে দু'প্রকার ব্যঞ্জন একত্রিত করেন এবং আপনার কাছে দু'প্রকার পোশাক আছে– এক প্রকার দিনের এবং এক প্রকার রাত্রের। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এছাড়া আরও কিছু শুনেছ? সালমান জওয়াব দিলেন ঃ না। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ এ দুটি দোষ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাক। এগুলোর যুক্তিযুক্ত কারণ আছে। তিনি

হযরত হুযায়ফা (রাঃ)- কে জিজ্ঞেস করতেন ঃ আপনি মোনাফেকদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে অনেক কিছু জানেন। বলুন, আমার মধ্যে মোনাফেকীর কোন আলামত আছে কি না? সোবহানাল্লাহ, এত উচ্চ মর্যাদা সত্ত্বেও তিনি নিজের নফসকে কতটুকু দোষী মনে করতেন! সুতরাং যে কেউ অধিক বোধশক্তি ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন হবে, সে দোষ কম করবে এবং নিজেকে অধিক দোষী মনে করবে। আজ-কাল এমন বন্ধু পাওয়া দুষ্কর, যে চক্ষুলজ্জা দুরে রেখে দোষ বলে দিবে। আজ-কালকার বন্ধু হিংসুটে ও স্বার্থপর। ফলে যেটা দোষ নয়, সেটাকেও দোষ মনে করে অথবা খোশামোদের কারণে দোষ গোপন করে। এ কারণেই দাঊদ তায়ী মানুষের সাথে উঠাবসা বর্জন করেছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি মানুষের সাথে মেলামেশা করেন না কেন? তিনি বললেন ঃ এমন লোকদের সাথে মেলামেশা করলে আমার লাভ কি, যারা আমার দোষ গোপন রাখে। মোট কথা, ধার্মিক লোকদের বাসনা এটাই থাকে যে, অপরের বলে দেয়ার কারণে তারা নিজেদের দোষ সম্পর্কে অবহিত হবেন। কিন্তু এখন যমানা এমন হয়ে গেছে যে, কেউ উপদেশের কথা বললে এবং দোষ প্রকাশ করলে তাকে বড় দুশমন গণ্য করা হয়। এটা ঈমান দুর্বল হওয়ার লক্ষণ। কেননা, অসচ্চরিত্রতা সর্প ও বিচ্ছুর মত। যদি কেউ আমাদেরকে বলে, তোমার কাপড়ে বিচ্ছু রয়েছে, তবে আমাদের তার কাছে ঋণী হওয়া এবং খুশী হয়ে বিচ্ছুকে আলাদা করতে ও মেরে ফেলতে সচেষ্ট হওয়া উচিত! অথচ বিচ্ছুর বিষ মাত্র একদিন অথবা আরও কম সময় থাকে। আর অসচ্চরিত্রতার শাস্তি মৃত্যুর পরও হাজারো বছর পর্যন্ত থাকে! কিন্তু অসচ্চরিত্রতার কথা কেউ বললে আমরা তার প্রতি খুশী এবং তা দূর করতে সচেষ্ট হই না; বরং এর বিপরীতে উপদেশদাতার কোন দোষ বলতে শুরু করে দেই যে, তোমার মধ্যেও অমুক দোষ আছে। এটা অধিক গোনাহের কারণে অন্তর কঠোর হয়ে যাওয়ার চিহ্ন। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন সঠিক পথ দেখান এবং আমাদের দোষ সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করে তার চিকিৎসায় ব্যাপৃত করে দেন। কেউ কোন দোষ বলে দিলে আমরা যেন তার কাছে ঋণী ও কৃতজ্ঞ হই।

তৃতীয় উপায় হচ্ছে, নিজের দোষ শত্রুর মুখ থেকে জেনে নেয়া। কেননা, শত্রুরা ছিদ্রান্বেষী হয়ে থাকে। এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, মানুষ এ ব্যাপারে বন্ধুর তুলনায় ছিদ্রান্বেষী শত্রু দ্বারা অধিক উপকৃত হতে পারে। কেননা, বন্ধু খোশামোদের কারণে দোষ প্রকাশ করে না। কিন্তু

মুশকিল হচ্ছে, মানুষ জন্মগতভাবে শত্রুর উক্তিকে মিথ্যা ও হিংসা-প্রণোদিত জানে। তবে অন্তশ্চক্ষুর অধিকারী ব্যক্তিগণ শত্রুর কথা দ্বারাও উপকৃত হন।

চতুর্থ উপায় হচ্ছে, মানুষের সাথে মেলামেশা করে তাদের মধ্যে খারাপ যা দেখবে, নিজেকে তা থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। কেননা, মুমিনগণ একজন অপরজনের আয়না। অপরের দোষ দেখে তারা নিজেদের দোষ জেনে নেয়। তারা জানে যে, প্রকৃতি সব মানুষের কাছাকাছি হয়ে থাকে। যে দোষ একজনের মধ্যে থাকে, তার মূল অপরের মধ্যে থাকবে কিংবা আরও বেশী থাকবে। এই শাসনপদ্ধতি খুবই উত্তম। একে কার্যকর করলে মুর্শিদ ও আদব শিক্ষাদাতার কোন প্রয়োজন থাকে না। হযরত ঈসা (আঃ)-কে লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ আপনাকে কে শিষ্টাচার শিক্ষা দিল? তিনি বললেন ঃ আমাকে কেউ শিষ্টাচার শেখায়নি। মূর্খের মূর্খতা আমার কাছে খারাপ মনে হয়েছে। তাই আমি একে পরিহার করেছি।

কামবর্জন আন্তরিক রোগের চিকিৎসা

উপরোক্ত বর্ণনা গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে মানুষের অন্তশ্চক্ষু খুলে যাবে এবং অন্তরের যাবতীয় রোগ তার চিকিৎসাসহ এলেম ও একীনের নূর দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে যাবে। যদি কেউ এতে অক্ষম হয়, তবে তার উচিত তাকলীদ তথা অনুসরণের পন্থায় ঈমান আনা। কেননা, ঈমান এবং এলেমের স্তর আলাদা। এলেম ঈমানের পরে অর্জিত হয় এবং তার মর্তবাও ঈমানের উপরে। আল্লাহ বলেন ঃ

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ -

–তোমাদের মধ্যে যারা মুমিন এবং যারা এলেমপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্তবা উঁচু করেন।

সুতরাং যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, কামপ্রবৃত্তির বিরোধিতা আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার সিঁড়ি, কিন্তু এর কারণ ও রহস্য জানে না, সে মুমিন। আর যখন সে কারণ ও রহস্যও অবগত হয়ে যায়, তখন সে আলেম। وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى আল্লাহ তাদের প্রত্যেককেই পুণ্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কামপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণের এই উপকারিতা বিশ্বাস করা কোরআন ও বিজ্ঞজনদের উক্তি দ্বারা প্রমাণিত। কোরআনে বলা হয়েছে–

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى -

–এবং যে নিজেকে খেয়ালখুশী থেকে বিরত রাখে, জান্নাতই তার ঠিকানা।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُ بَيْنَ خَمْسِ شَدَائِدَ مُؤْمِنٍ يَحْسُدُهُ وَمُنَافِقٍ يُبْغِضُهُ وَكَافِرٍ يُقَاتِلُهُ وَشَيْطَانٍ يُضِلُّهُ وَنَفْسٍ تُنَازِعُهُ ـ

–মুমিন ব্যক্তি পাঁচটি সংকটের মধ্যে থাকে– এক, মুমিন, যে তার প্রতি হিংসা রাখে। দুই, মোনাফেক, যে তার সাথে শত্রুতা করে। তিন, কাফের, যে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। চার, শয়তান, যে তাকে বিভ্রান্ত রাখে। পাঁচ, নফস, যে তার সাথে তর্ক করে।'

এতে বর্ণিত হয়েছে, মানুষের নফস তার সাথে তর্ক করে বিধায় সাধনা করা জরুরী। এক রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাঊদ (আঃ)-এর কাছে এই মর্মে ওহী পাঠালেন– হে দাঊদ, তোমার অনুচরবর্গকে খাহেশের খাদ্য থেকে বাঁচিয়ে রাখ। কেননা, যে সকল অন্তর জাগতিক খাহেশের সাথে জড়িত, তারা আমা থেকে আড়ালে থাকে। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্যে, যে বর্তমানের খাহেশকে ভবিষ্যত অদেখা ওয়াদার জন্যে ছেড়ে দেয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জেহাদ থেকে প্রত্যাবর্তনকারীদেরকে বলেছিলেন ঃ

مَرْحَبًا بِكُمْ قَدِمْتُمْ مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ ـ

–তোমাদেরকে মারহাবা, তোমরা ক্ষুদ্র জেহাদ থেকে বৃহৎ জেহাদের দিকে ফিরে এসেছ। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেনঃ বৃহৎ জেহাদ কি? তিনি বললেন, নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ। তিনি আরও বলেন ঃ

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِى طَاعَةِ اللّٰهِ ـ

–মুজাহিদ সেই, যে আল্লাহর আনুগত্যে আপন নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ করে।

হযরত মুফিয়ান সওরী বলেন ঃ নফসের চিকিৎসা অপেক্ষা কঠিনতর চিকিৎসা আমি দেখিনি। এটা কখনও উপকারী হয় এবং কখনও ক্ষতিকর। আবুল আব্বাস মুসেলী আপন নফসকে বলতেন ঃ তুমি তো শাহজাদাদের সাথে দুনিয়ার আনন্দ পাও না এবং আখেরাতের অন্বেষণে এবাদতকারীদের সাথে কষ্ট সহ্য কর না। তুমি কি আমাকে জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যস্থলে বন্দী করবে? তোমার লজ্জা হয় না? হাসান বসরী

বলেন ঃ অবাধ্য ঘোড়াকেও নফসের চেয়ে অধিক শক্ত লাগামের প্রয়োজন হয় না। **ইয়াহইয়া** ইবনে মুয়ায বলেন ঃ নফসের বিরুদ্ধে সাধনার তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করা উচিত। সাধনা চার প্রকার –অল্প আহার করা, অল্প নিদ্রা যাওয়া, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু কথা বলা এবং সকল মানুষের পীড়ন সহ্য করা। অল্প আহার করলে খাহেশের মৃত্যু ঘটে। অল্প নিদ্রায় নিয়ত পরিষ্কার হয়। কম কথা বললে বিপদ থেকে মুক্ত থাকা যায়। পীড়ন সহ্য করলে চূড়ান্ত মর্তবায় পৌঁছা যায়। তিনি আরও বলেন ঃ মানুষের দুশমন তিনটি– দুনিয়া, শয়তান ও নফস। সংসার নির্লিপ্ততার দ্বারা দুনিয়া থেকে শয়তান থেকে তার বিরোধিতা দ্বারা এবং নফ্স থেকে খাহেশ বর্জন দ্বারা আত্মরক্ষা করা উচিত। ইমাম জা'ফর সাদেক (রহঃ) বলেন ঃ আলেম ও দার্শনিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, আয়েশ পরিত্যাগ না করে চিরন্তন আয়েশ লাভ করা যায় না। আবু ইয়াহইয়া ওয়াররাক বলেন ঃ যে ব্যক্তি খাহেশের কাজ করে অঙ্গকে খুশী করে, সে অন্তরের কৃষিক্ষেত্রে পরিতাপের বীজ বপন করে। ওহায়ব ইবনে ওরদ বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ার খাহেশকে মহব্বত করে, সে যেন লাঞ্ছনা-গঞ্জনার জন্যে প্রস্তুত থাকে। হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন মিসরের শাসনকর্তা হন, তখন একদিন যুলায়খা আরজ করল ঃ হে ইউসুফ, লালসা ও কামনা বাদশাহকে গোলামে পরিণত করেছে। আর সবর ও তাকওয়া গোলামকে বাদশাহ করেছে। হযরত ইউসুফ বললেন ঃ এটা তো আল্লাহ তা'আলারই উক্তি। তিনি বলেন ঃ

اِنَّهُ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَايُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

–নিশ্চয় যে তাকওয়া করে ও সবর করে, আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার বিনষ্ট করেন না।

হযরত জুনায়েদ বলেন ঃ একবার আমি রাত্রে জাগ্রত হয়ে নামাযে দাঁড়ালাম। কিন্তু সব সময় যে আনন্দ পেতাম, তা পেলাম না। এর পর ঘুমিয়ে পড়ার ইচ্ছা করলাম। তাও সম্ভব হল না। এর পর বসে থাকতে চাইলাম। তাও সম্ভব হল না। অবশেষে গৃহ থেকে বের হয়ে পড়লাম। পথিমধ্যে দেখলাম, এক ব্যক্তি গায়ে কম্বল জড়িয়ে শুয়ে আছে। সে আমার পদশব্দ শুনে বলল ঃ হে আবুল কাসেম, আমার কাছে একটু আসুন। আমি বললাম ঃ মিয়া, তুমি পূর্বে তো আমাকে সংবাদ দাওনি। সে বলল ঃ ঠিক, তবে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলাম আপনার মনকে আমার দিকে গতিশীল করার জন্যে। আমি বললাম ঃ এটা আল্লাহ

তা'আলা করেছেন। এখন বল, তোমার উদ্দেশ্য কি ? সে বলল ঃ নফস ব্যাধিগ্রস্ত হলে তার চিকিৎসা কিভাবে হয় ? আমি জওয়াব দিলাম ঃ মানুষ যখন নফসের খাহেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তখন কষ্ট হয় বটে; কিন্তু এটাই তার চিকিৎসা। অতঃপর লোকটি তার নফসকে সম্বোধন করে বলতে লাগল ঃ শুন, আমি তোকে সাতবার এ জওয়াবই দিয়েছিলাম। তুই মানলি না এবং বললি যে, জুনায়দের মুখে শুনবি। এখন শুনলি তো? এর পর লোকটি সেখান থেকে প্রস্থান করল। আমি তাকে চিনতে পারলাম না। ইয়াযীদ রাক্কাশী বলতেন ঃ তোমরা আমাকে ঠান্ডা পানি দিয়ো না। আখেরাতে আবার কোথাও এ থেকে বঞ্চিত না হয়ে যাই। এক ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযকে জিজ্ঞেস করল ঃ আমি কখন কথা বলব ? তিনি বললেন ঃ যখন তোমার নফস চুপ থাকতে চায়। লোকটি আবার প্রশ্ন করল ঃ কখন চুপ থাকব? জওয়াব হল ঃ যখন সে কথা বলতে চায়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যে জান্নাতের জন্যে উৎসুক, সে যেন দুনিয়াতে খাহেশ থেকে আলাদা থাকে। এসব রেওয়ায়াতদৃষ্টে আলেম ও দার্শনিকগণের এ বিষয়ে ঐকমত্য বুঝা যায় যে, পরকালীন সৌভাগ্য অর্জনের পথ খেয়ালখুশী বর্জন ও খাহেশের বিরোধিতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সুতরাং এ বিষয়ে বিশ্বাস করা ওয়াজিব।

যে বস্তু কবরে সঙ্গে যায় না, তা দ্বারা প্রয়োজন অনুযায়ী উপকৃত হওয়াই মূল সাধনা। অর্থাৎ আহার্য, পোশাক, বিবাহ, বাসস্থান ও অন্যান্য জরুরী বস্তু দ্বারা প্রয়োজন অনুযায়ী উপকৃত হবে। এর বেশী যতটুকু হবে, ততটুকুর সাথেই মহব্বত ও মনের টান হবে। মৃত্যুর পর এর কারণেই পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার বাসনা প্রকাশ করবে। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় আছে। তা হচ্ছে, অন্তর আল্লাহ তা'আলার মারেফত, মহব্বত ও চিন্তায় মশগুল থাকবে এবং একমাত্র তাঁরই হয়ে থাকবে। এ ক্ষেত্রে মানুষ চার প্রকার। প্রথম তারা, যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে নিমজ্জিত থাকে এবং জীবিকার প্রয়োজন ছাড়া দুনিয়ার দিকে ভ্রূক্ষেপই করে না। এরা হলেন সিদ্দীকীন। এই মর্তবা দীর্ঘ দিনের সাধনা ও খাহেশ বর্জনের পর অর্জিত হয়।

দ্বিতীয় প্রকার সেই ব্যক্তি, যার অন্তর দুনিয়াতে নিমজ্জিত এবং আল্লাহর যিকির কেবল মুখে হয়, অন্তর দ্বারা নয়। এরূপ ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় প্রকার সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়া আখেরাত উভয়ের কাজে মশগুল, কিন্তু অন্তরের উপর আখেরাত প্রবল। এরূপ ব্যক্তি অগ্নিতে অবশ্য প্রবেশ করবে; কিন্তু অন্তরের উপর আল্লাহর যিকির যত

জোরদার হবে, তত শীঘ্রই মুক্তি পাবে। চতুর্থ প্রকার সেই ব্যক্তি, যে উভয়ের কাজে মশগুল; কিন্তু অন্তরের উপর দুনিয়া প্রবল। এ ব্যক্তি বেশী দিন দোযখে থাকবে এবং একদিন না একদিন মুক্তি পাবে। কেননা,তার অন্তরে দুনিয়া প্রবল হলেও সে আল্লাহর যিকির অন্তরের অন্তস্তল থেকে করত। এর ফলেই সে মুক্তি পাবে। ইলাহী, আমাদেরকে লাঞ্ছনা থেকে বাঁচান। আমীন।

কতক লোক বলে, বৈধ বস্তু দ্বারা আনন্দ লাভ করা বৈধ। সুতরাং এর কারণে আল্লাহ থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হবে কেন? কিন্তু এটা তাদের খামখেয়ালী। প্রকৃত সত্য হচ্ছে حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ –দুনিয়ার মহব্বত প্রত্যেক গোনাহের মূল। বৈধ বস্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে তা দুনিয়া ছাড়া কিছু নয় । এটাই দূরত্বের কারণ। "দুনিয়ার নিন্দা" অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। ইবরাহীম খাওয়াস (রহঃ) বলেন ঃ আমি একবার লাকাম পাহাড়ে ছিলাম। একটি ডালিম দেখে তা খেতে মন চাইল। সেমতে ডালিমটি ছিঁড়ে মুখে দিতেই টক মনে হল। আমি ডালিমটি ফেলে দিয়ে চলতে লাগলাম। পথিমধ্যে এক ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখলাম। তার উপর বোলতা ভনভন করছিল। সে আমাকে দেখে বলল ঃ আসসালামু আলাইকা ইয়া ইবরাহীম– হে ইবরাহীম তোমাকে সালাম। আমি বললাম ঃ তুমি আমাকে চিনলে কিরূপে? সে বলল ঃ যে আল্লাহকে চেনে, তার সামনে কোন কিছু গোপন থাকে না। আমি বললাম ঃ তুমি তো সিদ্ধ পুরুষ। আল্লাহর কাছে দোয়া কর না কেন, যাতে তোমাকে এই বোলতার কবল থেকে রক্ষা করেন ? সে বলল ঃ আপনিও তো কামেল পুরুষ। ডালিমের খাহেশ থেকে আপনার অন্তরকে বাঁচানোর জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন না কেন? বোলতার কষ্ট তো দুনিয়া পর্যন্তই। কিন্তু খাহেশের দুঃখ আখেরাত পর্যন্ত থাকবে। অতঃপর আমি নিরুত্তর হয়ে সেখান থেকে চলে গেলাম। সিররী সকতী বলেন ঃ চল্লিশ বছর ধরে আমার মন চাইছে যে, রুটি কিশমিশের ঘন রসে ভিজিয়ে খাই। কিন্তু আমি খাইনি।

এ থেকে জানা গেল, আখেরাতের পথে চলার জন্যে অন্তরের সংশোধন ততক্ষণ হয় না, যতক্ষণ নফসকে খাহেশ এবং বৈধ বস্তুর আনন্দ থেকে ফিরিয়ে না রাখা যায়। কেননা, বৈধ বস্তুর আনন্দের কারণে মানুষ নিষিদ্ধ বস্তুর মধ্যে পড়ে যায়। উদাহরণতঃ যদি কেউ গীবত ও অনর্থক কথাবার্তা মুখে উচ্চারণ করতে না চায়, তবে তার উচিত আল্লাহর

যিকির ও প্রয়োজনীয় ধর্মীয় কথাবার্তা ছাড়া অন্য কোন কথা উচ্চরণ না করা এবং চুপ থাকা। এতে তার কথা বলার খাহেশ ফানা হয়ে যাবে। এর পর যে কথা বলবে, তা হক এবং কথা বলা ও চুপ থাকা উভয়টি এবাদত হবে। এমনিভাবে যদি চোখের এই অভ্যাস প্রকাশ পায় যে, সে প্রত্যেক ভাল বস্তুর উপর পতিত হয়, তবে হারাম বস্তুর উপরও পতিত হবে। অন্যান্য খাহেশের বেলায়ও এরূপ বুঝতে হবে। কেননা, হারাম হালাল উভয়ের খাহেশ একটিই। তবে হারাম থেকে খাহেশকে আটকে রাখার আদেশ আছে। সুতরাং যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুকে যথেষ্ট মনে করার অভ্যাস গড়ে না তুললে খাহেশ প্রবল হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে বৈধ বিষয়াদির সামান্যতম বিপদ। এ ছাড়া আরও বড় বড় বিপদ হচ্ছে, দুনিয়ার আনন্দ পেয়ে নফ্‌স খুশী হয়, তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং মাতালের মত হয়ে যায়। অথচ এই খুশী তার জন্যে বিষতুল্য। এটা শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ে। এরই নাম অন্তরের মৃত্যু। কোরআন পাকের অনেক জায়গায় দুনিয়া ও দুনিয়ার কারণে আনন্দিত হওয়ার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে।

নিম্নে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হল ঃ

وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوْا بِهَا

–তারা পার্থিব জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে এবং এর দ্বারাই প্রশান্তি লাভ করেছে।

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ

–আখেরাতের হিসাবে পার্থিব জীবন কিছুই নয়; কিন্তু সামান্য সম্ভোগ।

اِعْلَمُوْا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ـ

–জেনে রাখ, পার্থিব জীবন খেল-তামাশা, সাজসজ্জা, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির আধিক্য বৈ কিছু নয়।

এছাড়া সাবধানী অন্তরসম্পন্ন ব্যক্তিগণ পরীক্ষা করে পার্থিব আনন্দের অবস্থায় অন্তরকে কঠোর, অবাধ্য এবং যিকির দ্বারা কম প্রভাবিত পেয়েছেন, বিষণ্ন অবস্থায় নম্র, পরিষ্কার ও প্রভাবিত দেখেছেন। তারা জেনে নিয়েছেন যে, মানুষের মুক্তি এতেই নিহিত রয়েছে যে, তারা

সদা-সর্বদা বিষণ্ন এবং আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের কারণাদি থেকে বহু দূরে থাকবে। এ কারণেই তারা হালাল-হারাম নির্বিশেষে সকল প্রকার খাহেশ থেকে সবর করার অভ্যাস গড়ে তুলেছেন। তারা আরও জেনেছেন, হালাল খাহেশেরও হিসাব হবে, যা এক প্রকার আযাব। এসব কারণে তারা নিজেদেরকে এই কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন এবং খাহেশের গোলামী ও বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে উভয় জাহানের স্বাধীনতা এবং বাদশাহী গ্রহণ করেছেন। তারা নিজেদের নফসের সাথে এমন ব্যবহার করেছেন, যা বাজপাখীর সাথে পোষ মানানোর সময় করা হয়। অর্থাৎ প্রথমে বাজপাখীকে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রাখা হয় এবং তার চক্ষু সেলাই করে দেয়া হয়, যাতে শূন্যে উড়া পরিত্যাগ করে, যার অভ্যাস পূর্বে ছিল। এর পর তাকে গোশত খাওয়ানো হয়, যাতে মালিককে চেনে এবং তার ডাক শুনে তার কাছে চলে আসে। এমনিভাবে নফসও তার পরওয়ারদেগারকে চেনে না। তাই প্রথমে নির্জনবাস দ্বারা তার অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়ে পরিচিত বিষয়সমূহ থেকে চক্ষু ও কর্ণের হেফাযত করা হয়। এর পর আল্লাহ্‌র যিকির ও প্রশংসার অভ্যাস গড়ে তোলা হয়। অবশেষে এর সাথেই অন্তরের ভালবাসা স্থাপিত হয়ে যায় এবং পার্থিব ভালবাসা যাবতীয় খাহেশসহ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। এটা মুরীদের কাছে প্রথমে কঠিন মনে হয়; কিন্তু পরিণামে স্বাদ পেয়ে যায়। যেমন দুগ্ধপোষ্য শিশুর দুধ ছাড়িয়ে দিলে প্রথমে কেমন ক্রন্দন করে। দুধের পরিবর্তে যে খাদ্য তার সামনে আনা হয়, তাকেও ঘৃণা করে; কিন্তু পরিণামে সে একেই ভাল মনে করে।

সচ্চরিত্রতার আলামত

মানুষ নিজের দোষ-ত্রুটির খবর রাখে না। তাই যখন সামান্য সাধনা করে বড় বড় পাপকর্ম ছেড়ে দেয়, তখন মনে করতে থাকে যে, সে সংস্কৃতিবান, ভদ্র ও চরিত্রবান হয়ে গেছে। এখন সাধনার প্রয়োজন নেই। তাই সচ্চরিত্রতার আলামত বর্ণনা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কেননা, সচ্চরিত্রতা সাক্ষাৎ ঈমান এবং অসচ্চরিত্রতা সাক্ষাৎ মোনাফেকী। কোরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের গুণাবলী এবং মোনাফেকদের স্বভাব-চরিত্র বর্ণনা করে দিয়েছেন। এগুলো সব সচ্চরিত্রতা ও অসচ্চরিত্রতার ফল। এখানে তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে, যাতে সচ্চরিত্রতার আলামত জানা হয়ে যায়। বলা হয়েছে–

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ

عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ -------- أُولٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ -

–মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নামাযে বিনম্র হয়, যারা বাজে বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যাকাত প্রদান করে, লজ্জাস্থানকে বাঁচিয়ে রাখে, কিন্তু আপন স্ত্রীদের ক্ষেত্রে নয়।

اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ -------- وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

–তওবাকারী, এবাদতকারী, প্রশংসাকারী,........ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন।

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا - الى اخر السورة -

–রহমান আল্লাহর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে। তাদের সাথে যখন মূর্খরা তর্ক করতে চায় ,তখন তারা বলে, সালাম। যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশে সেজদাবনত ও দণ্ডায়মান হয়ে। যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা,আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ। বসবাসস্থল হিসেবে এটা কত নিকৃষ্ট! তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না। তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। তারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের এবাদত করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ কাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। কিন্তু যারা তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

অতএব নিজের অবস্থা সম্পর্কে যার মনে সংশয় দেখা দেয়, সে এসব আয়াতের আয়নায় নিজেকে পরখ করে দেখুক। যদি তার সকল অবস্থা আয়াতগুলোর সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন হয়, তবে তার সচ্চরিত্রতা অর্জিত হয়েছে বুঝতে হবে। আর যদি কোন সঙ্গতি না থাকে, তবে এটা অসচ্চরিত্রতার আলামত হবে। পক্ষান্তরে যদি কিছু অবস্থা সঙ্গতিসম্পন্ন হয় এবং কিছু না হয়, তবে সেই পরিমাণ ত্রুটি আছে বুঝতে হবে। এমতাবস্থায় যা অর্জিত হয়েছে, তার হেফাযত করা এবং যা অর্জিত হয়নি, তা অর্জন করার জন্যে সচেষ্ট হবে। রসূলে করীম (সাঃ) মুমিনের অনেক

গুণ বর্ণনা করে সচ্চরিত্রতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। উদাহরণতঃ কয়েকটি রেওয়ায়াত এই ঃ

اَلْمُؤْمِنُ مَنْ يُحِبُّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ -

–মুমিন সেই, যে তার ভাইয়ের জন্যে তাই পছন্দ করে, যা নিজের জন্যে পছন্দ করে।

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ -

–যে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে।

এক রেওয়ায়াতে আছে ঃ فَلْيُكْرِمْ جَارَهٗ

–সে যেন তার প্রতিবেশীর সম্মান করে।

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে– فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ يَصْمُتْ

–সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে।

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ اَخْلَاقًا اِذَا رَأَيْتُمُ الْمُؤْمِنَ صَمُوْتًا وَقُوْرًا فَادْنُوْا مِنْهُ فَاِنَّهٗ يُلَقَّنُ الْحِكْمَةَ

–মুমিনের মধ্যে যার চরিত্র অধিক সুন্দর, তার ঈমান অধিক পূর্ণাঙ্গ। তোমরা যখন মুমিনকে চুপচাপ গাম্ভীর্যপূর্ণ দেখ, তখন তার নিকটবর্তী হও। কারণ, তাকে প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয়া হয়।

مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهٗ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهٗ فَهُوَ مُؤْمِنٌ

–যাকে পুণ্য কাজ আনন্দিত করে এবং কুকর্ম দুঃখিত করে, সে মুমিন।

لَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

–মুমিনের জন্যে কোন মুসলমানকে ভীতি প্রদর্শন করা জায়েয নয়।

اِنَّمَا يَتَجَالَسُ الْمُتَجَالِسَانِ بِاَمَانَةِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فَلَا يَحِلُّ لِاَحَدِهِمَا اَنْ يُّخْشٰى عَلٰى اَخِيْهِ مَا يَكْرَهُهٗ -

–দু'ব্যক্তি আল্লাহর আমানতের উপর একত্রে উপবেশন করে। অতএব একজনের জন্যে হালাল হবে না যে, সে এমন কথা বলে যা অপরের জন্যে অপছন্দনীয় হয়।

কেউ কেউ সচ্চরিত্রতার সকল আলামত একত্রে সন্নিবেশিত করেছেন এবং বলেছেন ঃ সচ্চরিত্র সেই ব্যক্তি, যে অধিক লজ্জাশীল, অধিক উপদেশদাতা, কম কষ্টদাতা, স্বল্পভাষী, অধিক কর্মী, সত্যবাদী, সাধু, গম্ভীর, ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ, সন্তুষ্ট, সহনশীল, উত্তম সঙ্গী, পুণ্যবান, স্নেহশীল, প্রফুল্ল এবং যে কুভাষী, অপবাদদাতা, হিংসুটে, বিদ্বেষ পোষণকারী ও কৃপণ নয়, হিংসা ও শত্রুতা আল্লাহর নিমিত্তই করে, সন্তুষ্টি এবং মহব্বতও আল্লাহর ওয়াস্তেই পোষণ করে। এতটুকু বিশেষণ দ্বারা সচ্চরিত্র হওয়া যায়। রসূলে আকরাম (সাঃ)-কে মুমিন ও মোনাফেকের আলামাত জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ

اِنَّ الْمُؤْمِنَ هِمَّتُهٗ فِى الصَّلٰوةِ وَالصِّيَامِ وَالْمُنَافِقَ هِمَّتُهٗ فِى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ كَالْبَهَائِمِ

–মুমিনের সাহসিকতা নামায, রোযা ও এবাদতে এবং মোনাফেকের সাহসিকতা চতুষ্পদ জন্তুদের ন্যায় পানাহারে হয়ে থাকে।

হযরত হাতেম আসাম (রহঃ) বলেন, মুমিন শিক্ষা গ্রহণের চিন্তায় আর মোনাফেক লোভ ও লালসায় মশগুল থাকে। মুমিন আল্লাহ ব্যতীত কারও কাছে কিছু আশা করে না, আর মোনাফেক আল্লাহ ব্যতীত সকলের কাছে আশা করে। মুমিন আল্লাহ ব্যতীত সকলের তরফ থেকে নিরাপদ ও নির্ভীক থাকে, আর মোনাফেক আল্লাহ ব্যতীত সকলকে ভয় করে। মুমিন ধন-সম্পদ দেয়– ধার্মিকতা দেয় না, আর মোনাফেক ধার্মিকতা দেয়– ধন সম্পদ দেয় না। মুমিন পুণ্য কাজ করে কাঁদে, আর মোনাফেক গোনাহ করে হাসে। মুমিনের কাছে নির্জনবাস ভাল মনে হয়, আর মোনাফেকের কাছে জমজমাট অবস্থা উত্তম বিবেচিত হয়। মুমিন চাষাবাদ করে এবং তা নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে শংকিত থাকে, আর মোনাফেক মূলোৎপাটন করে ও শস্যের গোলা আশা করে। মুমিন জনশাসনে আদেশ ও নিষেধের মাধ্যমে সংস্কার করে, আর মোনাফেক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় আদেশ ও নিষেধের মাধ্যমে গোলযোগ সৃষ্টি করে। সচ্চরিত্রতার প্রথম পরীক্ষা নিপীড়নে সবর দ্বারা হয়। সুতরং যে অপরের অসচ্চরিত্রতার অভিযোগ করে, এটা তার নিজেরই অসচ্চরিত্রতার প্রমাণ। কেননা, সচ্চরিত্রতা যুলুম ও নিপীড়ন সহ্য করার নাম। হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন মোটা পাড়ের নাজরানী চাদর পরিধান করে পথ চলছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হযরত আনাস (রাঃ)। জনৈক বেদুঈন পথিমধ্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাদর ধরে

এমন সজোরে টান মারল যে, চাদরের পাড় তাঁর ঘাড়ে বিদ্ধ হয়ে গেল। বেদুঈন বলল ঃ হে মুহাম্মদ, তোমার কাছে আল্লাহর যে ধন-সম্পদ রয়েছে, তা থেকে আমাকেও দাও। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বেদুঈনের দিকে তাকালেন এবং হেসে কিছু দিয়ে দিলেন। তাঁর প্রতি কোরায়শদের নির্যাতনের মাত্রা যখন চরমে পৌঁছে, তখন তিনি এই বলে দোয়া করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

–হে আল্লাহ, আমার কওমকে ক্ষমা করুন, তারা জানে না।

কেউ কেউ বলেন, এ দোয়াটি তিনি ওহুদ যুদ্ধে করেছিলেন। মোট কথা, এসব কারণেই আল্লাহ তাআলা তাঁর শানে এরশাদ করেন ঃ

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ –নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।

বর্ণিত আছে, একদিন ইবরাহীম আদহাম কোন জঙ্গলে চলার সময় জনৈক সিপাহীর সাক্ষাৎ পান। সিপাহী জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি কি বান্দা (দাস)? তিনি বললেন ঃ হাঁ। সিপাহী প্রশ্ন করল ঃ জনবসতি কোন্ দিকে? তিনি গোরস্থানের দিকে ইশারা করলে সিপাহী রেগে বলল ঃ আমি আবাদীর কথা জিজ্ঞেস করছি। তিনি বললেন ঃ গোরস্থানই আবাদী। এতে সিপাহী গোসসার আতিশয্যে তাঁর মস্তকে এমন বেত্রাঘাত করল যে, মস্তক ফেটে গেল। এর পর সিপাহী তাঁকে গ্রেফতার করে শহরে নিয়ে এল। পরিচিতরা এসে ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করলে সিপাহী সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। পরিচিতরা বলল ঃ সর্বনাশ করেছ। ইনি তো ইবরাহীম আদহাম। সিপাহী একথা শুনতেই ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে ইবরাহীম আদহামের হস্তপদ চুম্বন করতে লাগল। এর পর লোকেরা ইবরাহীম আদহামকে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কেন বললেন, আপনি বান্দা? তিনি বললেন ঃ সিপাহী আমাকে একথা জিজ্ঞেস করেনি যে, তুমি কার বান্দা? বরং সে শুধু বলেছে, তুমি কি বান্দা? আমি যেহেতু আল্লাহর বান্দা, তাই বলে দিয়েছি, হাঁ, আমি বান্দা। এর পর সে যখন আমাকে বেত্রাঘাত করল, তখন আমি তার জন্যে জান্নাতের দোয়া করেছি। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ সে তো আপনার উপর যুলুম করেছে। তিনি বললেন ঃ আমার বিশ্বাস ছিল, তার এ যুলুমের কারণে আমি সওয়াব পাব। তাই আমি ভাল মনে করিনি যে, যার কারণে আমি সওয়াব পাব, আমার কারণে তার আযাব হোক।

আবু ওসমান হিরীকে এক ব্যক্তি পরীক্ষার উদ্দেশে দাওয়াতের বাহানায় আপন গৃহে ডেকে আনল। তিনি যখন তার গৃহে পৌঁছলেন, তখন লোকটি বলল ঃ এক্ষণে কিছু আহার্য যোগাড় করা সম্ভব হল না। তিনি ফিরে গেলেন। অনেক দূরে চলে যাওয়ার পর লোকটি এসে বলল ঃ উপস্থিত ক্ষেত্রে যা মওজুদ আছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। তিনি যখন পুনরায় গৃহের দরজায় পৌঁছলেন, তখন লোকটি পূর্বের কথার পুনরাবৃত্তি করল। তিনি আবার ফিরে গেলেন। লোকটি এমনিভাবে কয়েকবার ডেকে আনল এবং ফিরিয়ে দিল। কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্রও মনঃক্ষুণ্ন হলেন না। এর পর লোকটি তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল ঃ মাফ করবেন, আমি আপনাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। সোবহানাল্লাহ, কি চরিত্র আপনার! তিনি বললেন ঃ তুমি আমার যে বিষয়টি দেখেছ, সেটি হচ্ছে কুকুরের স্বভাব। যখন ডাক, চলে আসে। যখন তাড়িয়ে দাও, চলে যায়।

আবু ওসমান হিরীরই আরেকটি ঘটনা বর্ণিত আছে। একদিন তিনি সওয়ার হয়ে এক গলিপথে গমন করছিলেন। উপর থেকে কেউ তাঁর উপর ছাই নিক্ষেপ করল। তিনি তৎক্ষণাৎ সওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন এবং আল্লাহর উদ্দেশে কৃতজ্ঞতার সেজদা করলেন। লোকেরা বলল ঃ আপনি ছাই নিক্ষেপকারীকে ধমক দিলেন না কেন ? তিনি জওয়াবে বললেন ঃ যে ব্যক্তি আগুনের যোগ্য তার উপর ছাই পড়লে গোসসা করা শোভা পায় না।

বর্ণিত আছে, হযরত আলী ইবনে মূসা (রঃ)-এর গায়ের রঙ শ্যামল ছিল। কারণ, তাঁর জননী ছিলেন হাবশী বংশোদ্ভূত। নিশাপুরে তাঁর গৃহের কাছে একটি হাম্মাম ছিল। তিনি হাম্মামে যেতে চাইলে পরিচালক তাঁর জন্যে হাম্মাম খালি করে দিত। একদিন তিনি যখন হাম্মামে গেলেন, তখন পরিচালক দরজা ভিড়িয়ে কোন কাজে চলে গেল। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি এসে দরজা খুলে হাম্মামের ভিতরে গেল। সে হযরত আলী ইবনে মূসাকে দেখে মনে করল, হাম্মামের কোন খাদেম হবে। সে বলল ঃ উঠ, আমার জন্যে পানি আন। তিনি তার আদেশ পালন করলেন এবং আরও যা যা আদেশ হল সবই আনজাম দিলেন। হাম্মামের পরিচালক ফিরে এসে আগন্তুকের কাপড় দেখতে পেল এবং আলী ইবনে মূসার সঙ্গে তার কথাবার্তা শুনল। অমনি সে ভয়ে পালিয়ে গেল। তিনি হাম্মাম থেকে বের হয়ে পরিচালকের নিকট খোঁজ নিয়ে জানলেন, সে ভয়ে পালিয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ সে পালিয়ে গেল কেন? দোষ তো সে ব্যক্তির, যে তার বীর্য হাবশী মহিলার কাছে সমর্পণ করেছিল।

আবু আবদুল্লাহ্ খাইয়াত (দর্জি) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি দোকানে বসে কাপড় সেলাই করতেন। জনৈক অগ্নিপূজারী তাঁর কাছ থেকে কাপড় সেলাই করিয়ে নিত এবং শত্রুতাবশত মজুরি বাবদ অচল মুদ্রা দিয়ে যেত। তিনি এ মুদ্রা ফেরত দিতেন না এবং তাকে কিছু বলতেনও না। একদিন অগ্নিপূজারী মজুরি দিতে এসে তাঁকে পেল না। তাঁর শাগরেদ দোকানে বসা ছিল। তাকে মজুরি দিয়ে কাপড় চাইলে শাগরেদ অচল মুদ্রা দেখে ফিরিয়ে দিল। আবু আবদুল্লাহ এসে জানতে পেরে বললেন, তুমি ভাল করনি। এই অগ্নিপূজারী এক বছর ধরে এ কাজ করে যাচ্ছে। আমি চুপচাপ মজুরি নিয়ে কূপে ফেলে দেই, যাতে সে কোন মুসলমানকে ধোঁকা দিতে না পারে।

সহল তস্তরীকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ সচ্চরিত্রতা কি? তিনি বললেন ঃ সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে প্রতিশোধ না নেয়া, নিপীড়ন সহ্য করা এবং যালেমের প্রতি অনুকম্পা করে তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করা। আহনাফ ইবনে কায়সকে প্রশ্ন করা হল, আপনি সহনশীলতা কার কাছে শিখলেন? তিনি বললেন ঃ কায়স ইবনে আসেমের কাছে। লোকেরা বলল ঃ তার সহনশীলতা কিরূপ ছিল? তিনি বললেন ঃ একদিন তিনি গৃহে উপবিষ্ট ছিলেন। বাঁদী একটি কাবাবপূর্ণ শিক তাঁর কাছে নিয়ে এল। ঘটনাক্রমে শিকটি বাঁদীর হাত থেকে খসে গিয়ে তাঁর অল্পবয়স্ক ছেলের উপর পতিত হল। আঘাতের চোটে ছেলেটি মারা গেল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় বাঁদী ভয়ে কাপতে লাগল। তিনি বললেন ঃ ভয় করিস না। আমি তোকে আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত করে দিলাম।

হযরত ওয়ায়েস কারনী সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁকে যখন ডানপিটে ছেলেরা দেখত, তখন পাথর ছুঁড়ে মারতো। তিনি তাদেরকে উদ্দেশ করে বলতেন ঃ ভাই সকল, যদি মারতেই হয়, তবে ছোট ছোট পাথর মার, যাতে আমার পা থেকে রক্ত বের না হয় এবং নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে। একবার আহনাফ ইবনে কায়সকে জনৈক ব্যক্তি গালি দিতে শুরু করে। তিনি চুপচাপ চলে গেলেন এবং মহল্লার নিকটে পৌঁছে বললেন ঃ যদি মনে আরও কিছু গালি থেকে থাকে, তবে তাও বলে ফেল। কোথাও মহল্লার কোন বেওকুফ তোমার গালি শুনে তোমার উপর চড়াও না হয়।

হযরত আলী (রাঃ) একবার তাঁর গোলামকে ডাকলেন। সে জওয়াব দিল না। এর পর তিনি দ্বিতীয় বার ও তৃততীয় বার ডাকলেন, কিন্তু গোলামের তরফ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অতঃপর তিনি স্বয়ং

গোলামের কাছে গিয়ে দেখলেন, সে দিব্যি শুয়ে আছে। তিনি বললেনঃ তুমি আমার ডাক শুননি? গোলাম বলল ঃ শুনেছি। তিনি বললেন ঃ তা হলে জওয়াব দিলে না কেন? গোলাম আরজ করল ঃ আপনি মারবেন- এরূপ ভয় আমার মোটেই ছিল না। তাই অবহেলাবশত জওয়াব দেইনি। হযরত আলী বললেন ঃ যাও, আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত করে দিলাম।

মালেক ইবনে দীনারকে লক্ষ্য করে জনৈকা মহিলা বলল, হে রিয়াকার। তিনি বললেন ঃ তুমি চমৎকার এ নামটি বের করেছ, যা বসরার লোকেরা ভুলে গিয়েছিল।

এসব রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, সাধনার ফলে এসব পুণ্যাত্মাদের নফস শিথিল হয়ে পড়েছিল এবং চরিত্র সমতার পর্যায়ে এসে গিয়েছিল। এর ফলে তাঁরা আল্লাহর তকদীরে সন্তুষ্ট ছিলেন, যা সচ্চরিত্রতার চূড়ান্ত সীমা। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাজকে ভাল মনে করে না এবং তাতে সন্তুষ্ট হয় না, তার চরিত্র নিঃসন্দেহে অসৎ।

শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সচ্চরিত্রতা

শিশুদের চরিত্র গঠন একটি নেহায়েত জরুরী বিষয়। শিশুরা পিতামাতার কাছে একটি আমানত। শিশুর অন্তর একটি উৎকৃষ্ট মুক্তা, সরল, অকৃত্রিম, সকল চিত্র থেকে মুক্ত এবং প্রত্যেক চিত্র গ্রহণের যোগ্য হয়ে থাকে। এই অন্তরকে যেদিকে ঝুঁকানো যায়- উদাহরণতঃ যদি তাকে উত্তম শিক্ষা দেয়া হয় এবং সততায় অভ্যস্ত করা হয়, তবে বড় হয়েও তাই করবে এবং উভয় জাহানের সৌভাগ্য অর্জন করবে। এই সওয়াবে পিতামাতা, ওস্তাদ, আদব শিক্ষাদাতা সকলেই অংশীদার হবে। পক্ষান্তরে যদি শিশুকে কুশিক্ষায় অভ্যস্ত করা হয় এবং জানোয়ারদের মত বল্গাহীন ছেড়ে দেয়া হয়, তবে শিশু নিশ্চিতই বরবাদ হয়ে যাবে এবং এর দায়-দায়িত্ব শিশুর মুরব্বির উপর বর্তাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

-মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে অগ্নি থেকে রক্ষা কর।

পিতা যখন দুনিয়ার অগ্নি থেকে তার সন্তানদেরকে রক্ষা করে, তখন আখেরাতের অগ্নি থেকে রক্ষা করা আরও বেশী জরুরী হয়ে পড়ে। আখেরাতের অগ্নি থেকে রক্ষা করার উপায় হচ্ছে সন্তানকে শিষ্টাচার,

ভদ্রতা ও সচ্চরিত্রতা শিক্ষা দেয়া, কুসংসর্গ থেকে দূরে রাখা এবং সাজসজ্জা, বিলাসিতা ও আরামপ্রিয়তাকে তার দৃষ্টিতে হেয় করা, যাতে বড় হয়ে এগুলোর অন্বেষণ না করে। শুরু থেকেই শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করা জরুরী। সেমতে তাকে কোন পুণ্যবতী, ধর্মপরায়ণা ও হালালখোর মহিলার দুধ পান করাবে। কেননা, হারামের দুধে বরকত হয় না। শৈশবে হারামের দুধ পান করলে তা বিবেকের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। ফলে বড় হয়ে সে দুশ্চরিত্রতার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

শিশুর মধ্যে যখন কিছু সদ্বিবেচনা শুরু হয়, তখন তার অধিক দেখাশুনা করা জরুরী। লজ্জা-শরমের বিকাশ দ্বারা সদ্বিবেচনার সূচনা হয়। ফলে শিশু কতক কাজ-কর্ম লজ্জাবশত ছেড়ে দেয়। এটা এ কারণে হয় যে, তখন তার মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধিরূপী নূরের ঝলক এসে যায় এবং সে কতক বিষয়কে কতক বিষয়ের তুলনায় খারাপ মনে করে। ফলে কুকর্ম করতে লজ্জাবোধ করে। আল্লাহ তাআলার এ দানটি চরিত্রের সমতা ও অন্তরের পরিচ্ছন্নতা জ্ঞাপন করে। এতে বুঝা যায়, বড় হয়ে সে পূর্ণ বুদ্ধিমান হবে। এমন লজ্জাশীল শিশুকে অযত্নে ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। বরং লজ্জা ও শিষ্টাচার আয়ত্তের কাজে তাকে সাহায্য করা দরকার।

শুরুতে শিশুর মধ্যে যে স্বভাব প্রবল হয়, তা হচ্ছে খাওয়ার বাসনা। অতএব এরই শিষ্টাচার তাকে শেখানো উচিত। অর্থাৎ সে ডান হাতে খাবে। খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ বলবে। সম্মুখভাগ থেকে খাবে। অন্যের আগে খাওয়া শুরু করবে না। খাদ্যের দিকে চক্ষু বিস্ফারিত করে তাকাবে না। তড়িঘড়ি করে খাবে না। উত্তমরূপে চিবিয়ে খাবে। মুখে উপর্যুপরি লোকমা দেবে না। মাঝে মাঝে তরকারি ছাড়া শুধু রুটি খাওয়ার অভ্যাস করবে, যাতে সে বুঝে, তরকারি দিয়ে রুটি খাওয়া জরুরী নয়।

শিশুর সামনে অধিক ভোজনের নিন্দা করা উচিত। যারা অল্প ভোজন করে তার সামনে তাদের প্রশংসা করবে। অপরকে খানা দেয়া যে ভাল, এ বিষয়টিও তার দৃষ্টিতে ফুটিয়ে তুলবে। পোশাকের মধ্যে সাদা পোশাক শিশুকে পছন্দ করানো উচিত। রঙীন ও রেশমী পোশাক সম্বন্ধে বলে দেবে, এগুলো নারীদের পোশাক। পুরুষেরা এগুলোকে খারাপ মনে করে।

এরপর শিশুকে মক্তবে পাঠিয়ে কোরআন হাদীস ও সৎকর্মপরায়ণদের গল্প শেখানো উচিত, যাতে তার মনে সৎকর্মপরায়ণদের প্রতি মহব্বত প্রতিষ্ঠিত হয়। শিশুকে এশক ও প্রেমের কবিতা পাঠ করতে দেবে না। কেননা, এতে অন্তরে অনর্থের বীজ বপন করা হয়। শিশু কোন উত্তম কাজ

করলে তাকে পুরস্কৃত করবে। এতে সে খুশী হবে। এক, দু'বার খেলাফ কাজ করলে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে, পর্দা উন্মোচন করবে না। বিশেষভাবে এমন কাজে যা শিশু নিজেই গোপন করে। কেননা, সে যদি জেনে নেয় যে, এ কাজটি প্রকাশ হয়ে পড়ায় কিছু হয়নি, তবে ভবিষ্যতে আরও দুঃসাহসী হয়ে যাবে। পুনরায় এ খারাপ কাজটি করলে তাকে গোপনে শাসাবে। শিশুকে সদাসর্বদা শাসানো উচিত নয়। এতে সে তিরস্কারে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং মন্দ কাজ করার সাহস বেড়ে যায়। পিতার ন্যায় মাতাও শিশুকে মন্দ কাজে বাধা দেবে এবং পিতার ভয় দেখাবে।

শিশুকে নরম বিছানা দেবে না, এতে তার দেহ শক্ত হয় এবং সে আরামপ্রিয় হয় না। এমনিভাবে পোশাক ও খাদ্যের ব্যাপারেও শিশুকে আরামপ্রিয় হতে দেয়া উচিত নয়।

মক্তব থেকে ফিরে আসার পর শিশুকে কোন ভাল খেলার অনুমতি দেয়া উচিত, যাতে মক্তবের শ্রম লাঘব হয়। কিন্তু এত বেশী খেলবে না যাতে, ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এতটুকু খেলার অনুমতি না দিলে এবং শিক্ষায় সব সময় কঠোরতা করলে শিশুর মন মরে যায়, জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। ফলে সে শিক্ষা থেকে মুক্তি পাওয়ার বাহানা খুঁজতে থাকে। শিশু সদ্বিবেচনার বয়সে পৌঁছলে তাকে ওযু ও নামায শিক্ষা দেবে। রমযান মাসে কিছু কিছু রোযা রাখাবে।

হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ তস্তরী বলেন ঃ আমি তিন বছর বয়সে রাত্রে জাগ্রত হতাম এবং আমার মামা মুহাম্মদ ইবনে সেওয়ারকে নামায পড়তে দেখতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি আল্লাহর যিকির কর না কেন, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন? আমি বললাম ঃ কিভাবে যিকির করব? তিনি বললেন ঃ তুমি যখন শয়ন কর, তখন তিনবার এ শব্দগুলো মনে মনে বলে নিবে– জিহ্বা নড়াচড়া করবে না; اَللّٰهُ مَعِىْ اَللّٰهُ نَاظِرِىْ اَللّٰهُ شَاهِدِىْ (আল্লাহ আমার সঙ্গে আছেন, আল্লাহ আমাকে দেখেন, আল্লাহ আমার সাক্ষ্যদাতা।) আমি কয়েক রাত্রি পর্যন্ত তাই করলাম এবং তাঁকে জানালাম। মামা বললেন ঃ এখন থেকে সাত বার বল। আমি তাই করলাম। এর পর তিনি আমাকে এগার বার বলতে আদেশ করলেন। আমি প্রত্যহ এগার বার বলতে শুরু করলে অন্তরে এর স্বাদ অনুভব করলাম। এক বছর পর মামা বললেন ঃ আমি তোমাকে যা শেখালাম, তা মনে রাখবে এবং সদাসর্বদা কবরে যাওয়া পর্যন্ত বলে যাবে। এটা উভয় জাহানে তোমার উপকারে আসবে। আমি

কয়েক বছর পর্যন্ত এই ওযীফা পাঠ করে অন্তরে আরও বেশী মিষ্টতা অনুভব করলাম। একদিন মামা বললেন– সহল, যার সাথে আল্লাহ থাকেন, যাকে তিনি দেখেন এবং যার তিনি সাক্ষী হন, সে কি তার নাফরমানী করতে পারে? খবরদার, আল্লাহর নাফরমানী করো না। অতঃপর আমি একান্তে এই যিকিরই করতাম। যখন আমাকে মক্তবে প্রেরণ করা হল, তখন এই যিকিরে ত্রুটির আশংকা করে আমি ওস্তাদের সাথে শর্ত করলাম, এক ঘন্টা পড়াশুনা করে চলে আসব। মক্তবে গিয়ে ছয় অথবা সাত বছর বয়সে আমি কোরআন শরীফ হেফয করে নিলাম। আমি সর্বদা রোযা রাখতাম এবং বার বছর বয়স পর্যন্ত যবের রুটি খেলাম। তের বছর বয়সে আমার মনে একটি প্রশ্ন দেখা দিল, যার উত্তর পাওয়ার জন্যে আমি মুরব্বীদের অনুমতি নিয়ে বসরায় গেলাম এবং সেখানকার আলেমদের সামনে প্রশ্নটি রাখলাম। কিন্তু কেউ আমাকে সন্তোষজনক জওয়াব দিতে পারল না। অতঃপর আমি আবাদানে চলে গেলাম। সেখানে একজন আবু হাবীব নামক বুযুগ বসবাস করতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি সন্তোষজনক জওয়াব দিলেন। আমি তাঁর কাছে দীর্ঘ দিন অবস্থান করে তাঁর কালাম দ্বারা উপকৃত হলাম। এর পর তস্তরে চলে এলাম। এখানে এসে খাদ্য এই নির্ধারণ করলাম যে, এক দেরহামের যব ক্রয় করে তা পিষিয়ে সেহরীর সময় লবণবিহীন শুধু রুটি এক ছটাক পরিমাণে খেতাম। ফলে এক দেরহামই সারা বছরের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যেত। এর পর আমি তিন দিন উপর্যুপরি রোযা রাখতাম এবং একদিন রোযা রাখতাম না। অতঃপর পাঁচ দিন ও সাত দিন উপর্যুপরি রোযা রেখেছি। বিশ বছর এভাবেই অতিবাহিত হয়ে গেল। এর পর আমি কয়েক বছর বিভিন্ন দেশ সফর করেছি এবং তস্তরে ফিরে এসে সমগ্র রাত্রি জাগরণ অবলম্বন করেছি।

একাদশ অধ্যায়

উদর ও লজ্জাস্থানের খাহেশের প্রতিকার

জানা উচিত, উদরের খাহেশ আদম সন্তানের জন্যে বড় মারাত্মক, যার কারণে হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) চিরস্থায়ী জান্নাত থেকে এই ধ্বংসশীল পৃথিবীতে বহিষ্কৃত হন। তাঁদেরকে এক বিশেষ বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের খাহেশ প্রবল হওয়ায় তাঁরা তা খেয়ে ফেলেন। প্রকৃতপক্ষে উদর খাহেশের ঝরণা এবং আপদের খনি। কারণ, উদরের জন্যে নারী সম্ভোগের খাহেশ অপরিহার্য। পেটপূর্তি হলে একাধিক স্ত্রী ও অত্যাধিক সহবাসের বাসনা জাগ্রত হয়। এর পর ধন-সম্পদ ও জাঁকজমকের দিকে মন ঝুঁকে পড়ে। কেননা, এগুলো দ্বারা এই মতলব সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়। ধন-সম্পদের আধিক্য থেকে নানা রকমের ঔদ্ধত্য ও হিংসার সৃষ্টি হয় এবং এরই বদৌলতে রিয়া, পারস্পরিক গর্ব ও অহংকার জন্মলাভ করে, ফলে বিদ্বেষ ও শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। অবশেষে মানুষ অবাধ্যতা, নাফরমানী ও নিষিদ্ধ কাজ করতে শুরু করে। এগুলো সব এ বিষয়েরই ফল যে, উদরকে খালি না রেখে আকণ্ঠ ভরে নেয়া হয়। যদি মানুষ তার নফসকে ক্ষুধার্ত রেখে শয়তানের পথ সংকীর্ণ করে দেয়, তবে অবশ্যই সে আল্লাহর আনুগত্যের পথ থেকে পা উঠাবে না, অবাধ্যতা ও আস্ফালনের কাছেও ঘেঁষবে না, আখেরাত ছেড়ে দুনিয়াদার হয়ে থাকবে না এবং বাদানুবাদ ও কলহ কিনে নেবে না। এসব কারণে উদরের বিপদাপদ ও ধ্বংসকারিতা বর্ণনা করা এবং এ সম্পর্কিত মোজাহাদার পদ্ধতি ও ফযীলত ব্যাখ্যা করা অত্যাবশ্যক, যাতে মানুষ এ থেকে বেঁচে থাকে এবং মোজাহাদার প্রতি আকৃষ্ট হয়। লজ্জাস্থানের খাহেশও এমনি ধরনের, যা এর পরে আসে। তাই এর বর্ণনাও জরুরী। সেমতে আমরা এ বিষয়গুলোকে আটটি শিরোনামে বর্ণনা করব।

১॥ ক্ষুধার ফযীলত ও উদরপূর্তির নিন্দা

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

جَاهِدُوْا اَنْفُسَكُمْ بِالْجُوْعِ وَالْعَطَشِ فَاِنَّ الْاَجْرَ فِىْ ذٰلِكَ كَاَجْرِ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ جُوْعٍ وَ عَطَشٍ -

–তোমরা নফসের বিরুদ্ধে ক্ষুধা ও পিপাসা দ্বারা জেহাদ কর। এতে এমন সওয়াব, যেমন আল্লাহর পথে জেহাদকারীর সওয়াব। আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষুধা পিপাসার চেয়ে অধিক প্রিয় কোন আমল নেই।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আকাশের ফেরেশতা সেই ব্যক্তির কাছে আসে না, যে তার পেট ভরে নেয়। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ মানুষের মধ্যে উত্তম কে? তিনি বললেন ঃ مَنْ قَلَّ طَعْمُهُ وَضِحْكُهُ وَرَضِىَ بِمَا يَسْتُرُبِهِ عَوْرَتَهُ –যে কম খায়, কম হাসে এবং এমন পোশাকে সন্তুষ্ট থাকে, যা দ্বারা তার গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করতে পারে। আবু সায়ীদ খুদরীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ 'পশমী বস্ত্র পরিধান কর এবং আধাপেট খাও। এটা নবুওয়তের একাংশ।' হযরত হাসানের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ

اَفْضَلُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَطْوَلُكُمْ جُوْعًا وَتَفَكُّرًا فِى اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَاَبْغَضُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلُّ نَوَّامٍ اَكُوْلٍ شَرُوْبٍ -

–কেয়ামতে আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ মর্তবাশালী সেই ব্যক্তি হবে, যে অধিক ক্ষুধার্ত থাকবে এবং যিকির বেশী করবে। কেয়ামতে আল্লাহর কাছে অধিক ঘৃণিত সে ব্যক্তি হবে, যে অধিক নিদ্রা যায়, অধিক খায় এবং অধিক পান করে।

বর্ণিত আছে, রসূলে আকরাম (সাঃ) প্রয়োজনেও ক্ষুধার্ত থাকতেন, অর্থাৎ এটা তাঁর পছন্দনীয় ছিল। এক হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তির পানাহার দুনিয়াতে কম, আল্লাহ তাকে নিয়ে ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করেন এবং বলেন ঃ আমার বান্দাকে দেখ, আমি তাকে দুনিয়াতে পানাহার কম দিয়েছি। সে সবর করেছে। তোমরা সাক্ষী থাক, যে লোকমা সে ছেড়ে দেবে, তার বিনিময়ে জান্নাতে তাকে উচ্চ মর্তবা দান করব। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

لَاتُمِيْتُوا الْقَلْبَ بِكَثْرَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَاِنَّ الْقَلْبَ كَالزَّرْعِ يَمُوْتُ اِذَا كَثُرَ عَلَيْهِ الْمَاءُ -

–তোমরা অন্তরকে অধিক পানাহার দ্বারা মেরে ফেলো না। অন্তর কৃষিক্ষেত্রের মত। তাতে পানি বেশী হলে ফসল বিনষ্ট হয়ে যায়।'

উসামা ইবনে যায়েদ ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের অধিক নিকটবর্তী সে ব্যক্তিই হবে, যে দুনিয়াতে অধিক ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত ও চিন্তান্বিত থাকবে। এ ধরনের লোকেরা হচ্ছে গোপন মুত্তাকী। এরা আত্মপ্রকাশ করলে কেউ তাদেরকে চেনে না এবং অদৃশ্য হয়ে গেলে কেউ খোঁজে না। ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে। তারাই ভাল লোক। আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যও উত্তমরূপে তারাই করে। লোকেরা নরম নরম শয্যায় শয়ন করে। আর তারা নিজেদের মস্তক ও হাঁটু বিছিয়ে দেয়। পয়গম্বরগণের চরিত্র ও ক্রিয়াকর্ম তাদের মুখস্থ। যে জায়গা থেকে তারা চলে যায়, সেই জায়গা কাঁদে। যে শহরে তাদের কেউ না থাকে, সেই শহরের উপর গযব নাযিল হয়। তারা দুনিয়ার জন্যে মৃতের উপর কুকুরের মত লড়াই করে না। যে পরিমাণ খেলে নিঃশ্বাস বাকী থাকে, তারা সেই পরিমাণই খায় এবং ছিন্নবস্ত্র পরিধান করে। মলিন অবস্থার কারণে লোকে তাদেরকে রোগগ্রস্ত মনে করে ; অথচ তাদের কোন রোগ নেই। কেউ কেউ মনে করে, তাদের জ্ঞানবুদ্ধি বিলুপ্ত; অথচ এটাও নয়। পরকালের গৌরব তাদের জন্যেই। হে উসামা, যে শহরে এরূপ লোক দৃষ্টিগোচর হয়, জেনে নেবে, সেই শহরের শান্তির কারণ তারাই। যে সম্প্রদায়ের মধ্যে তারা থাকে, আল্লাহ সেই সম্প্রদায়কে আযাব দেন না। ভূপৃষ্ঠও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ তা'আলাও তাদের প্রতি রাযী। মানুষের মধ্যে তাদেরকে রাখার কারণ তাদের দ্বারা যথাসম্ভব মানুষকে মুক্তি দেয়া। তুমি যদি আমৃত্যু ক্ষুধা-পিপাসা সহ্য করতে পার, তবে কর। এর কারণে তুমি উচ্চ মর্যাদা পাবে এবং নবীগণের কাতারে দাখিল হবে। তোমার আত্মা যখন ফেরেশতাদের কাছে যাবে, তখন তারা আনন্দিত হবে এবং আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করবেন। হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

اِلْبَسُوا الصُّوفَ وَشَمِّرُوا وَكُلُوا فِى اَنْصَافِ الْبُطُونِ تَدْخُلُوا فِى مَلَكُوتِ السَّمَاءِ ـ

'পশম পরিধান কর এবং কর্মতৎপর থাক। আধাপেট আহার কর। তাহলে আকাশের ফেরেশতাদের মধ্যে দাখিল হয়ে যাবে।'

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ হে হাওয়ারীগণ, তোমাদের পাকস্থলীকে ক্ষুধাতুর এবং দেহ উলঙ্গ রাখ, যাতে তোমাদের অন্তর আল্লাহকে দেখে। তওরাতে লিখিত আছে– আল্লাহ কোন স্থূলদেহী আলেমকে পছন্দ করেন

না। কেননা, দৈহিক স্থূলতা অনবধানতা ও অধিক আহার জ্ঞাপন করে। এটা আলেমের জন্যে ভাল নয়। তাই হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেনঃ

যে আলেম পেট ভরে খেয়ে মোটা হয়েছে, আল্লাহ তাকে পছন্দ করেন না। এক হাদীসে আছে, শয়তান মানুষের মধ্যে রক্তের মত বিচরণ করে। তোমরা ক্ষুধা ও পিপাসা দ্বারা তার চলাচলের পথ সংকীর্ণ করে দাও।

এক হাদীসে বলা হয়েছে-

اَلْمُؤْمِنُ يَاكُلُ فِى مِعًا وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَاكُلُ فِى سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ

–মুমিন এক নাড়ি-ভুঁড়িতে এবং কাফের সাত নাড়ি-ভুঁড়িতে খায়।

অর্থাৎ মুমিনের তুলনায় কাফের সাত গুণ বেশী খায় কিংবা তার খাহেশ মুমিনের চেয়ে সাত গুণ বেশী হয়। রূপক অর্থে খাহেশের স্থলে নাড়ি-ভুঁড়ি ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীসের অর্থ এরূপ নয় যে, কাফেরের নাড়ি-ভুঁড়ি বাস্তবে মুমিনের তুলনায় বেশী হয়। হযরত হাসানের রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একথা বলতে শুনেছেন ঃ

اَدِيْمُوا قَرْعَ بَابِ الْجَنَّةِ يُفْتَحْ لَكُمْ

–তোমরা সর্বদা জান্নাতের দরজার কড়া নাড়। তোমাদের জন্যে তা খুলে যাবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ জান্নাতের দরজার কড়া কিরূপে নাড়া দেব ? তিনি বললেন ঃ بِالْجُوْعِ وَالظَّمَاءِ অর্থাৎ ক্ষুধা ও পিপাসা দ্বারা। হযরত আবু হুযায়ফা (রাঃ) একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মজলিসে ঢেকুর তুললে তিনি বললেন ঃ অধিক ঢেকুর তুলো না। কেননা, কেয়ামতের দিন সে ব্যক্তিই অধিক ক্ষুধার্ত হবে, যে দুনিয়াতে বেশী পেট ভরে খায়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনও পেটভরে আহার করেননি। মাঝে মাঝে তাঁর ক্ষুধা দেখে হযরত আয়েশার করুণা হত এবং তিনি কেঁদে দিতেন। তিনি তাঁর পেটে হাত বুলিয়ে বলতেন ঃ আপনার প্রতি আমি উৎসর্গ। দুনিয়া থেকে এতটুকু অংশ তো নিন, যদ্দারা শক্তি বহাল থাকে এবং ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়ে যায়। জওয়াবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন ঃ আয়েশা, আমার ভাইগণ অর্থাৎ প্রধান প্রধান পয়গম্বরগণ আমার চেয়েও অধিক কষ্ট সহ্য করেছেন। এসব কষ্টে সবর করে তাঁরা যখন পরওয়ারদেগারের কাছে গেছেন, তখন অত্যন্ত সম্মানিত হয়েছেন এবং অপরিসীম সওয়াব লাভ করেছেন। আমি লজ্জাবোধ করি,

কোথাও জীবনে কিছু আরাম ভোগ করার কারণে আখেরাতে তাঁদের চেয়ে কম মর্তবা লাভ করি। আখেরাতে কম মর্তবা পাওয়া অপেক্ষা দুনিয়াতে কয়েক দিন সবর করা সহজ। আপন ভাইদের সাথে মিলিত হওয়া ছাড়া আমার কাছে অন্য কিছু ভাল মনে হয় না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর কসম, এই কথাবার্তার পর এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যান। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন– একবার হযরত ফাতেমা (রাঃ) একখন্ড রুটি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত করেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কি ? হযরত ফাতেমা বললেন ঃ আমি একটি রুটি তৈরী করেছিলাম। আমার মনে চাইল, তাই এ খন্ডটি আপনার জন্যে এনেছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) রুটির টুকরাটি খেয়ে বললেন ঃ তিন দিন পর তোমার পিতার মুখে এই প্রথম খাদ্য পৌঁছল। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) সারা জীবনে কখনও পরিবার-পরিজনকে লাগাতার তিন দিন পেট ভরে গমের রুটি দেননি। তিনি বলতেন ঃ

اِنَّ اَهْلَ الْجُوْعِ فِى الدُّنْيَا هُمْ اَهْلُ الشَّبْعِ فِى الْاٰخِرَةِ وَاِنَّ اَبْغَضَ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ الْمُتَخِمُوْنَ الْمَلَأَ وَمَا تَرَكَ عَبْدٌ لُقْمَةً يَشْتَهِيْهَا اِلَّا كَانَتْ لَهُ دَرَجَةٌ فِى الْجَنَّةِ ـ

–দুনিয়াতে যারা ক্ষুধার্ত, আখেরাতে তারা তৃপ্ত হবে। আল্লাহ তা'আলার কাছে সে ব্যক্তি অধিক ঘৃণিত, যার বদহজম লেগে থাকে এবং পেট ভরে আহার করে। বান্দা খাহেশ সত্ত্বেও যে লোকমাটি ছেড়ে দেয়, তার বিনিময়ে সে জান্নাতে একটি স্তর লাভ করে।

ক্ষুধার ফযীলত সম্পর্কে মহাজন উক্তিও অনেক। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ উদরপূর্তি থেকে নিজেকে রক্ষা কর। কেননা, এটা জীবদ্দশায় দুর্মূল্যের এবং মৃত্যুর পর দুর্গন্ধের কারণ। হযরত শাকীক বলখী (রঃ) বলেন ঃ এবাদত একটি পেশা, যার দোকান হচ্ছে নির্জনতা এবং হাতিয়ার ক্ষুধা। হযরত লোকমান (রঃ) আপন পুত্রকে বলেন ঃ বৎস, যখন পাকস্থলী পূর্ণ থাকে, তখন চিন্তা ঝিমিয়ে পড়ে এবং এবাদতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেকার বসে থাকে। হযরত ফযল ইবনে আয়ায নিজেকে সম্বোধন করে বলতেন ঃ তোমার কিসের ভয়? ক্ষুধার ? ক্ষুধাকে ভয় করা উচিত নয়। কেননা, এর কারণেই তুমি আল্লাহ তা'আলার সামনে হালকা-পাতলা থাক। আল্লাহর রসূল ও তাঁর সকল সাহাবী ক্ষুধার্ত থাকতেন। কাহমস (রঃ) বলেন ঃ ইলাহী, তুমি আমাকে ক্ষুধার্ত রেখেছ, উলঙ্গ রেখেছ এবং অন্ধকার রাতে

প্রদীপহীন রেখেছ। কেমন কেমন ওসীলা দ্বারা আমাকে এই মর্তবায় পৌঁছিয়েছ। তওরাতে উল্লিখিত আছে– আল্লাহকে ভয় কর এবং যখন পেট ভরে আহার কর, তখন ক্ষুধার্তকে স্মরণ কর। আবু সোলায়মান (রঃ) বলেন ঃ রাতের খাদ্য থেকে এক লোকমা কম খাওয়া আমার কাছে সারারাত জেগে এবাদত করার চেয়ে ভাল মনে হয়। তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহর ভান্ডার থেকে ক্ষুধা তাকেই দান করা হয়, যাকে তিনি পছন্দ করেন। হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ তস্তরী (রঃ) পঁচিশ দিন পর্যন্ত খেতেন না এবং এক দেরহামের আটা দিয়ে এক বছর চালিয়ে দিতেন। তিনি ক্ষুধার উচ্চ মর্তবা বিশ্বাস করতেন এবং এ সম্পর্কে অতিশয়োক্তি করে বলতেন ঃ কেয়ামতের দিন কোন নেক আমলের এতটুকু সওয়াব হবে না, যতটুকু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণে বাড়তি খাদ্য ত্যাগ করলে হবে। তিনি আরও বলেন ঃ যারা আখেরাত তলব করে, তাদের জন্যে খাওয়ার চেয়ে অধিক ক্ষতিকর কিছু নেই। প্রজ্ঞা ও জ্ঞান ক্ষুধার মধ্যে এবং গোনাহ ও মূর্খতা তৃপ্তির মধ্যে নিহিত। যে হাদীসে বলা হয়েছে, পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্যে, সেই হাদীসের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি এই পরিমাণের চেয়ে বেশী খায়, সে তার পুণ্য খায়। এর চেয়ে উচ্চ মর্তবার কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ খাদ্য খাওয়ার তুলনায় না খাওয়া অধিক প্রিয় না হওয়া পর্যন্ত কারও ফযীলত লাভ হবে না। এক রাত ক্ষুধার্ত থাকলে আল্লাহর কাছে দু'রাত ক্ষুধার্ত থাকার জন্যে দোয়া করবে। এই অবস্থা অর্জিত হলে সে খাদ্য না খাওয়া প্রিয় মনে করবে। তিনি আরও বলেন ঃ যারা আবদাল হয়েছেন, তারা পেটকে ক্ষুধার্ত রাখা, রাত্রি জাগরণ ও একান্তবাস দ্বারা আবদাল হয়েছেন। আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়দ বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আল্লাহর মহব্বত পাওয়া যায় না, কিন্তু ক্ষুধা দ্বারা। ওলীগণ পানির উপর দিয়ে হেঁটে যান না, কিন্তু ক্ষুধার বদৌলত। তারা নিমেষের মধ্যে পথের দূরত্ব অতিক্রম করেন না, কিন্তু ক্ষুধার কারণে।

২ ॥ ক্ষুধার উপকারিতা ও তৃপ্তির বিপদাপদ

এক্ষণে প্রশ্ন হয়, ক্ষুধার এত ফযীলত কোত্থেকে এল এবং এর কারণ কি ? ক্ষুধা দ্বারা কেবল পাকস্থলী দুঃখ ও কষ্টই ভোগ করে। যদি কষ্টের মধ্যেই ফযীলত নিহিত থাকে, তবে যারা আত্মহত্যা করে অথবা আপন দেহের মাংস কাটে অথবা এমনি ধরনের কোন কান্ড করে, তাদের অধিক সওয়াব হওয়া উচিত। এর জওয়াব হচ্ছে,এটা এমন, যেমন কেউ ওষুধ সেবন করে সুস্থ হওয়ার পর মনে করতে থাকে যে, ওষুধের মধ্যে যে

তিক্ততা ছিল, তাতেই আমি সুস্থ হয়েছি। এর পর আরও অধিক তিক্ত ওষুধ খেতে শুরু করে। অথচ এটা ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। ওষুধের উপকারিতা তিক্ততার কারণে নয়। বরং ওষুধের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যা চিকিৎসকরা জানে। এমনিভাবে ক্ষুধার মধ্যে যেসব উপকারিতা রয়েছে, সেগুলো আলেমগণ জানেন। যে কেউ এর উপকারিতা বিশ্বাস করে নিজের জন্যে অবলম্বন করবে, সে নিঃসন্দেহে উপকৃত হবে, যদিও উপকারের কারণ তার অজানা থাকে। যেমন ঔষধ সেবনকারী কারণ না জানলেও ওষুধের উপকার পায়। কিন্তু যারা আপন জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ করতে চায়, তাদের জন্য নিম্নে আমরা ক্ষুধার দশটি উপকারিতা লিখে দিচ্ছি।

প্রথম উপকারিতা, ক্ষুধা দ্বারা অন্তরের পরিচ্ছন্নতা, স্বভাবের তীক্ষ্নতা এবং অন্তর্দৃষ্টির পূর্ণতা অর্জিত হয়। এর বিপরীতে তৃপ্তি স্থুলবুদ্ধিতা জন্ম দেয়, মেধা বিনষ্ট করে এবং মস্তিষ্কে নেশার মত পৌঁছে চিন্তা-ভাবনার জায়গাকে ঘিরে ফেলে। ফলে অন্তর ভারী হয়ে চিন্তার দিকে ধাবিত হয় না এবং দ্রুত অনুভব করতে পারে না। শিশুরা বেশী খেলে তাদের স্মরণশক্তিতে ত্রুটি দেখা দেয়। হযরত আবু সোলায়মান (রহঃ) বলেন ঃ ক্ষুধা অবলম্বন করা উচিত। এতে নফস লাঞ্ছিত এবং অন্তর সূক্ষ্ম হয়ে আসমানী জ্ঞান লাভের যোগ্য হয়। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেনঃ

اَحْيُوْا قُلُوْبَكُمْ بِقِلَّةِ الضِّحْكِ وَقِلَّةِ الشَّبْعِ وَطَهِّرُوْهَا بِالْجُوْعِ تَصْفُوْ وَتَرِقُّ -

–তোমাদের অন্তরকে কম হাসি ও কম তৃপ্তি দ্বারা পুনরুজ্জীবিত কর এবং পবিত্র কর ক্ষুধা দ্বারা। এতে তোমাদের অন্তর সাফ ও নরম হবে।

হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে পেট ভরে আহার করে ও নিদ্রা যায়, তার অন্তর কঠোর হয়ে যায়। অন্য এক রেওয়ায়েতে তিনি বলেন ঃ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكٰوةٌ وَزَكٰوةُ الْبَدَنِ الْجُوْعُ প্রত্যেক বস্তুর যাকাত আছে। দেহের যাকাত ক্ষুধা।

হযরত শিবলী (রহঃ) বলেন ঃ যখনই আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষুধার্ত থেকেছি, তখনই অন্তরে প্রজ্ঞা ও শিক্ষার একটি দরজা খোলা পেয়েছি, যা পূর্বে পাইনি।

হযরত আবু ইয়াযীদ বোস্তামী (রহ) বলেন ঃ ক্ষুধা একটি মেঘ। এর কারণে বান্দার অন্তরে হেকমতের বৃষ্টি বর্ষিত হয়। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ প্রজ্ঞার নূর হচ্ছে ক্ষুধা, আল্লাহ থেকে দূরত্ব হচ্ছে পেট ভরে খাওয়া এবং আল্লাহর নৈকট্য হচ্ছে মিসকীনদের ভালবাসা ও তাদের কাছে থাকা। তোমরা পেট ভরে খেয়ো না। খেলে অন্তর থেকে প্রজ্ঞার নূর নিভে যাবে। যে ব্যক্তি রাত্রি বেলায় সামান্য আহার করে নামায পড়ে, তার আশেপাশে সকাল পর্যন্ত বেহেশতের হুর থাকে।

দ্বিতীয় উপকারিতা হচ্ছে, অন্তরের নম্রতা, যা দ্বারা অন্তরের যিকিরের ক্রটি অনুভব করা যায়। প্রায়ই এমন হয় যে, অন্তরের উপস্থিতিসহ মুখে যিকির চালু থাকে; কিন্তু অন্তর তাতে প্রভাবিত হয় না। অন্তর ও প্রভাবের মধ্যে যেন আন্তরিক কঠোরতা আড়াল হয়ে যায়। আবার কোন সময় অন্তরে যিকিরের খুব প্রভাব পড়ে এবং মোনাজাতে আনন্দ পাওয়া যায়। এর বাহ্যিক কারণ পাকস্থলী খালি হওয়া। আবু সোলায়মান দারানী (রহঃ) বলেন ঃ আমি এবাদতে তখনই অধিক মিষ্টতা পাই, যখন আমার পিঠ পেটের সাথে লেগে থাকে। তিনি আরও বলেন ঃ অন্তর যখন ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকে, তখন পরিষ্কার ও পাতলা থাকে। পক্ষান্তরে যখন পেট ভর্তি থাকে, অন্ধ ও স্থুল হয়ে যায়।

তৃতীয় উপকারিতা হচ্ছে, বিনয় ও বশ্যতা অর্জিত হওয়া এবং দর্প ও অহংকার দূর হওয়া। ক্ষুধা দ্বারা নফস যতটুকু নম্র ও লাঞ্ছিত হয়, অন্য কোন কিছু দ্বারা ততটুকু হয় না। ক্ষুধার অবস্থায় নফস দুর্বল হয়ে যখন এক খন্ড রুটি ও এক চুমুক পানি পায় না, তখন মালিকের আনুগত্য করে ও অক্ষম হয়ে থাকে। নিজেকে অক্ষম অপারগ মনে করা এবং আল্লাহ ত'আলাকে পরাক্রমশালী মনে করার মধ্যেই মানুষের সৌভাগ্য নিহিত। তাই সর্বক্ষণ ক্ষুধার্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাশী থাকা নেহায়েত জরুরী। এ কারণেই যখন দুনিয়া ও তার সমস্ত ভান্ডার রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সামনে পেশ করা হয়েছিল, তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন–

لَا بَلْ اَجُوْعُ يَوْمًا وَاَشْبَعُ يَوْمًا فَاِذَا جِعْتُ صَبَرْتُ وَتَضَرَّعْتُ وَاِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُ -

–না, বরং আমি একদিন ক্ষুধার্ত থাকব ও একদিন তৃপ্তি সহকারে খাব। যখন ভুখা থাকব, তখন সবর করব ও আনুগত্য করব। আর যখন পেট ভরে খাব, তখন শোকর করব।

চতুর্থ উপকারিতা হচ্ছে, খোদায়ী আযাব ও বিপদগ্রস্তদের কষ্ট বিস্মৃত না হওয়া। কেননা, যারা পেট ভরে খায়, তারা ক্ষুধার্ত ও ক্ষুধা উভয়টি ভুলে যায়। হুশিয়ার ব্যক্তি কোন বিপদ দেখেই আখেরাতের বিপদ স্মরণ করে। সে পিপাসা দেখে কেয়ামতের মাঠে পরকালে পিপাসা স্মরণ করে এবং ক্ষুধা দেখে দোযখীদের ক্ষুধা স্মরণ করে। দোযখীরা ভুখা অবস্থায় কন্টকযুক্ত বৃক্ষ খাদ্য হিসেবে পাবে এবং পিপাসার সময় পুঁজ পাবে। যে ব্যক্তি কখনও ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট না করে, সে আখেরাতের আযাব ভুলে যায়। হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি ভুখা থাকেন কেন, আসমান ও যমীনের ধন-ভান্ডার তো আপনার করায়ত্ত? তিনি বললেন ঃ আমি আশংকা করি, পেট ভরে আহার করলে ভুখাদেরকে ভুলে যাব। এ থেকে বুঝা গেল, ভুখা ও অভাবগ্রস্তদেরকে স্মরণ করাও ক্ষুধার অন্যতম উপকারিতা। কারণ, ক্ষুধা থেকে দয়া, অন্নদান ও মানুষের প্রতি অনুকম্পা জন্ম লাভ করে।

পঞ্চম উপকারিতা হচ্ছে, খাহেশ চূর্ণ করা এবং "নফসে আম্মারা" তথা কুকর্মের আদেশদাতা নফসের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা। এ উপকারিতাটি সর্ববৃহৎ। বলা বাহুল্য, সকল গোনাহের মূল কারণ হচ্ছে খাহেশ ও শক্তি, যার উপাদান খাদ্য ও আহার্য। খাদ্য হ্রাস করলে যাবতীয় খাহেশ ও শক্তি দুর্বল এবং নিস্তেজ হয়ে পড়ে। মানুষের সৌভাগ্য সবটুকুই নফসকে কাবু করে রাখার মধ্যে এবং দুর্ভাগ্য সবটুকুই নফসের কাবুতে চলে যাওয়ার মধ্যে নিহিত। সেমতে অবাধ্য ঘোড়া যেমন দানাপানি না দিলে কাবুতে থাকে, তেমনি নফসকে ভুখা রাখলে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। জনৈক বুযুর্গকে লোকেরা বলল ঃ আপনি তো দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এখন নফসের খেদমত করেন না কেন? তিনি বললেন ঃ নফস দ্রুত আস্ফালন করতে থাকে এবং খুব দুষ্টামি করে। সে অবাধ্য হয়ে কোথাও আমাকে বিপদে না ফেলে দেয়, তাই তার খেদমত করি না। কোন গোনাহ করার চেয়ে নফসের সাথে কঠোরতা করাকেই আমি উত্তম মনে করি। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পরে সর্বপ্রথম যে বেদআতটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, তা ছিল, মানুষ তৃপ্ত হয়ে আহার করতে শুরু করল। পেট ভরে খেলে অবশ্যই তাদের নফস দুনিয়ার দিকে জোর দেখাবে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ ক্ষুধা আল্লাহ্ তা'আলার একটি ভাণ্ডার। এর সামান্যতম কাজ হচ্ছে লজ্জাস্থানের খাহেশ ও কথা বলার খাহেশ বিলোপ করা। কারণ, ভুখার মন বেশী কথা বলতে চায় না। ফলে সে মুখের আপদ তথা গীবত, অশ্লীলতা, মিথ্যাকথন ইত্যাদি থেকে নিরাপদ থাকে। যিনার ক্ষতি কারও কাছে গোপন নয়; কিন্তু ক্ষুধা দ্বারা মানুষ এর অনিষ্ট থেকেও নিরাপদ থাকে। পেট ভরে আহার করলে এই খাহেশ জোরদার হয়। আল্লাহর ভয়ে এ থেকে বিরত থাকলেও দৃষ্টিকে ফেরানো যায় না। এটাও যিনার মধ্যে দাখিল। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ যে মুরীদ পানাহারের শাসনে সবর করে, এক বছরকাল আধা পেট রুটি খায় এবং তাতে কোন দিলপছন্দ বস্তু মিশ্রিত না করে,আল্লাহ তা'আলা তার মন থেকে নারীর চিন্তা দূর করে দেন।

ষষ্ঠ উপকারিতা হচ্ছে, নিদ্রা দূর হওয়া এবং অধিক সময় জাগ্রত থাকা। কেননা, যে পেট ভরে খায়, সে অনেক পানি পান করে। অধিক পানি পান করার কারণে নিদ্রা বেশী আসে। কোন কোন বুযুর্গ এ কারণেই আহারের সময় মুরীদকে বলতেন ঃ বেশী আহার করো না। বেশী আহার করলে পানি বেশী পান করবে এবং নিদ্রা বেশী হবে।

সপ্তম উপকারিতা হচ্ছে, ক্ষুধা দ্বারা এবাদত অব্যাহত রাখা সহজ হয়। কেননা, স্বয়ং আহার করা অধিক এবাদতের পথে এ কারণে বাধা যে, এর জন্যে সময় ব্যয় করা প্রয়োজন। আটা ইত্যাদি ক্রয় করা ও রুটি তৈরী করার মধ্যেও বেশ সময় লেগে যায়। এ সময়কে যিকির, মোনাজাত ইত্যাদিতে ব্যয় করলে উপকার বেশী হত। হযরত সিররী (রহঃ) বলেন ঃ আমি জুরজানীর কাছে ছাতু দেখে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনার ছাতু খাওয়া ও রুটি না খাওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন, হিসাব করে দেখেছি, রুটি তৈরী করতে যে অতিরিক্ত সময় লাগবে তাতে সত্তর বার সোবহানাল্লাহ বলা যায়। তাই চল্লিশ বছর ধরে আমি রুটি খাওয়া ত্যাগ করেছি। চিন্তার বিষয়, তিনি সময় নষ্ট হওয়ার কথা কোথায় চিন্তা করেছেন এবং সময় নষ্ট হতে দেননি। এমনিভাবে মানুষের প্রত্যেকটি শ্বাস একটি অমূল্য সম্পদ। এর দ্বারা আখেরাতের অক্ষয় ভাণ্ডার অর্জন করা উচিত। এটা সময়কে আল্লাহর যিকর ও আনুগত্যে ব্যয় করার মাধ্যমে হয়। এছাড়া অধিক খাদ্য গ্রহণ করলে সব সময় পাকসাফ থাকা যায় না এবং মসজিদে অবস্থান করা যায় না। কেননা, বার বার পেশাব করার জন্যে যেতে হয়।

অষ্টম উপকারিতা হচ্ছে, দৈহিক সুস্থতা ও রোগব্যাধি প্রতিরোধ করা। কেননা, রোগব্যাধির কারণ হচ্ছে, অধিক ভোজন, যে কারণে অকর্মণ্য পিত্তাদি পাকস্থলী ও শিরায় একত্রিত থাকে। এর পর রোগী এবাদত করতে সক্ষম হয় না। মন সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকে এবং জীবন তিক্ত হয়ে

যায়। বর্ণিত আছে, খলীফা হারূনুর রশীদ একবার ভারত, রোম, ইরাক ও আবিসিনিয়া– এই চার দেশ থেকে চার জন খ্যাতনামা চিকিৎসককে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনারা এমন ওষুধের কথা বলুন যদ্দারা কোন রোগ হয় না। ভারতীয় চিকিৎসক বলল ঃ আমার মতে এরূপ ওষুধ হচ্ছে কাল হরীতকী। ইরাকী চিকিৎসক বলল ঃ আমার মতে এটা হচ্ছে তেরাতীযক। রোমীয় চিকিৎসক গরম পানির কথা বলল। তাদের মধ্যে সর্বাধিক বিজ্ঞ ছিল আবিসিনীয় চিকিৎসক। সে বলল ঃ হরীতকী খেলে পাকস্থলী সংকীর্ণ হয়ে যায়। এটাও একটা রোগ। তেরাতীযকের ফলে পাকস্থলী নরম হয়। এটা আলাদা ব্যাধি। গরম পানিতে পাকস্থলী দুর্বল হয়ে পড়ে, যা রোগ ছাড়া কিছু নয়। খলীফা জিজ্ঞেস করলেন ঃ তা হলে আপনার মতে এরূপ ওষুধ কোন্‌টি? সে জওয়াবে বলল ঃ আমার মতে যে ব্যবস্থার ফলে রোগ হয় না, তা হচ্ছে, আহার তখন করবে যখন খাহেশ হয় এবং খতম তখন করবে, যখন খাহেশ বাকী থাকে। সকলেই তার কথা মেনে নিল।

জনৈক আহলে কিতাব আলেমের সামনে এ হাদীসটি বর্ণনা করা হয় ঃ ثُلُثٌ لِطَعَامٍ ثُلُثٌ لِشَرَابٍ وَثُلُثٌ لِنَفَسٍ –পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্যে, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্যে এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাসের জন্যে।

আলেম আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন ঃ স্বল্পভোজন সম্পর্কে এর চেয়ে অধিক মযবুত উক্তি আমি আর শুনিনি। এ উক্তি নিশ্চয়ই কোন দার্শনিকের মনে হয়। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

اَلْبِطْنَةُ اَصْلُ الدَّاءِ وَالْحِمْيَةُ اَصْلُ الدَّوَاءِ وَعَوِّدُوْا كُلَّ جِسْمٍ مَا اعْتَادَ

–'উদরপূর্তি মূল রোগ, পরহেয করা মূল ওষুধ। দেহ যে যে বিষয়ে অভ্যস্ত হয়, তারই অভ্যাস গড়ে তোল।'

আমাদের মতে এ হাদীসটি চিকিৎসকের নিকট অধিক আশ্চর্য মনে হওয়ার যোগ্য।

নবম উপকারিতা হচ্ছে, ব্যয় কম হওয়া। কেননা, যে অল্প ভোজন করবে, তার জন্যে অল্প সামগ্রী যথেষ্ট হবে। মুমিন ব্যক্তির কর্তব্য খরচ কম করা। জনৈক আলেম বলেন ঃ আমি আমার অধিকাংশ প্রয়োজন এভাবে পূর্ণ করি যে, সেগুলো বাদ দিয়ে দেই। এতে অন্তর খুবই স্বস্তি

পায়। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) আপন সহচরদের কাছে খাদ্যদ্রব্যের দর জিজ্ঞেস করতেন। তারা দুর্মূল্যের কথা বললে তিনি বলতেন ঃ খাওয়া বর্জন করে সস্তা করে নাও।

দশম উপকারিতা হচ্ছে, কম আহারের কারণে যে খাদ্য বেঁচে যাবে, তা সদকা-খয়রাতে ব্যয় করা যাবে। মানুষ যে পরিমাণ খাদ্য খেয়ে নেয়, তা মাটি ও পায়খানা হয়ে যায়। আর যে পরিমাণ সদকা করে, তা আল্লাহর রহমত লাভের জন্যে ভাণ্ডার হয়ে থাকে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক ব্যক্তির ভুঁড়ির দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বললেন ঃ যদি এই পরিমাণ অন্যের পেটে যেত, তবে তোমার জন্যে মঙ্গলজনক হত। অর্থাৎ, তুমি যদি আপন খাদ্য হ্রাস করে অন্যকে খাওয়াতে, তবে তা আখেরাতের জন্য ভাণ্ডার হত। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমরা এমন লোক দেখেছি, যাদের কাছে সামান্যই খাদ্য ছিল। ইচ্ছা করলে তারা সবটুকু খেতে পারতেন; কিন্তু তারা বলতেন ঃ আমরা সবটুকু নিজেদের পেটে দেব না। কিছু আল্লাহর জন্যেও রেখে দেব।

৩ ॥ উদরের খাহেশ চূর্ণকারী সাধনা

উদর ও খাদ্যের ব্যাপারে মুরীদের উচিত চারটি বিষয় নির্দিষ্ট করে নেয়া ঃ (১) খাদ্যের পরিমাণ, (২) খাদ্যের সময়, (৩) খাদ্যের শ্রেণী এবং (৪) পরহেযের স্তর। শেষোক্ত বিষয়টি আমরা হালাল ও হারাম অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। এখানে প্রথমোক্ত তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে। প্রথম কথা, খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করতে হবে এবং এতে ধাপে ধাপে সাধনা করতে হবে, যাতে একটি অনুমানে পৌঁছা যায়। কারণ, অতিভোজনে অভ্যস্ত কোন ব্যক্তি যদি হঠাৎ খাদ্য হ্রাস করে দেয়, তবে কষ্টও বেশী হবে এবং দুর্বলতা হেতু সাধনা সহ্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। সুতরাং অল্প অল্প করে খাদ্য হ্রাস করতে হবে। উদাহরণতঃ যদি কেউ দু'রুটি খায় এবং তা হ্রাস করে এক রুটিতে আনতে চায়, তবে পূর্ণ এক মাস সময়ের মধ্যে তা হ্রাস করা যায়। প্রথমে দু'রুটির পরিমাণ ওযন করবে। এর পর প্রত্যহ এক রুটির ওযনের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ হ্রাস করবে। অথবা লোকমার গণনার মাধ্যমেও এটা করা যায়। এভাবে কোন ক্ষতি অথবা বিরূপ প্রভাবের আশংকা নেই। খাদ্যের পরিমাণের চারটি স্তর আছে। এক, এতটুকু কম, যাতে জীবনটা কোন রকমে বেঁচে যায়। এটা সিদ্দীকগণের স্তর। সহল তস্তরী (রহঃ)ও একেই পছন্দ করেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা জীবন, বুদ্ধি-বিবেচনা ও শক্তি– এই তিনটি বিষয় দ্বারা এবাদাত করান। যদি বান্দা জীবন ও বুদ্ধি-বিবেচনা

বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা করে, তবে আহার করবে- রোযা রাখবে, মাঝে মাঝে রোযা ছাড়াও থাকবে। খাদ্য নিজের কাছে না থাকলে তালাশ করবে। আর যদি এ দু'টি বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা না হয়– কেবল শক্তি বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা হয়, তবে খাদ্যের কোন পরওয়া করবে না, যদিও দুর্বলতার কারণে বসে বসে নামায পড়তে হয়। এক্ষেত্রে বিশ্বাস করতে হবে যে, উপবাসের দুর্বলতার কারণে বসে নামায পড়া খাদ্যের শক্তি দ্বারা দাঁড়িয়ে নামায পড়ার তুলনায় উত্তম। কেউ তার খাদ্যের অবস্থা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি সারা বছরে তিন দেরহামের খাদ্য খাই। এক দেরহামের বিনিময়ে আঙ্গুরের ঘন রস ক্রয় করি, এক দেরহাম দিয়ে চাউলের আটা এবং এক দেরহাম দিয়ে ঘি কিনে নেই। এর পর সবগুলো মিলিয়ে তিনশ' ষাটটি বড়ি তৈরি করে নেই। প্রতি রাতে এক বড়ি দিয়ে ইফতার করি। তবে আজকাল সময়ের কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই। জনৈক সংসারত্যাগী সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি আপন খাদ্য সাড়ে তিন মাশা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে ছিলেন।

দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে, দিনে-রাতে পাঁচ ছটাক পরিমাণে খাদ্য খাবে। সম্ভবত এটা অধিকাংশ লোকের এক-তৃতীয়াংশ পেটের সমান হবে, যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর অভ্যাস তাই ছিল। তিনি সাত লোকমা অথবা নয় লোকমা খেতেন।

তৃতীয় স্তর হচ্ছে, সারা দিনে আড়াই পোয়া পরিমাণে আহার করবে। এটা পেটের এক-তৃতীয়াংশের বেশী এবং খুব সম্ভব দু-তৃতীয়াংশের সমান। এমতাবস্থায় এক-তৃতীয়াংশ পেট পানীয়ের জন্য থেকে যাবে।

চতুর্থ স্তর হচ্ছে, আরও বাড়িয়ে এক সের পর্যন্ত আহার করবে। এর বেশী খাওয়া অপব্যয়ের মধ্যে দাখিল এবং (ولا تسرفوا) এই খোদায়ী আদেশের বিপরীত। এখানে বুঝা দরকার, অধিকাংশের দিকে লক্ষ্য করে উপরোক্ত স্তরসমূহ বর্ণিত হয়েছে। নতুবা খাদ্যের পরিমাণ ব্যক্তি, বয়স ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্মের দিকে লক্ষ্য করে প্রত্যেকের জন্যে আলাদা।

পঞ্চম স্তর হচ্ছে, সত্যিকার খাহেশ হলে আহার করবে এবং সত্যিকার খাহেশ বাকী থাকা অবস্থায় হাত গুটিয়ে নেবে; কিন্তু এক রুটি অথবা দু'রুটির পরিমাণ নির্দিষ্ট না করলে সত্যিকার খাহেশের শেষ সীমা প্রকাশ পাবে না। তবে সত্যিকার খাহেশের আলামত এই লিখিত আছে যে, যে কোন রুটি পেলে তা খেয়ে নেয়া। যদি নির্দিষ্ট রুটি মনে চায় কিংবা তরকারিও কামনা করে, তবে খাহেশ সত্যিকার হবে না।

আরেকটি আলামত হচ্ছে, থুথু ফেললে তাতে মাছি বসবে না। অর্থাৎ থুথুর মধ্যে তৈলাক্ততা না থাকায় বুঝা যায়, পাকস্থলী শূন্য। সুতরাং সত্যিকার খাহেশের পরিচয় কঠিন। সুতরাং মুরীদের জন্যে এটাই উত্তম যে, খাদ্যের একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নেবে, যাতে যে এবাদত সে করে, তা সুন্দররূপে আনজাম দিতে পারে– তাতে দুর্বল না হয়ে পড়ে। এ সীমায় পৌঁছে যাওয়ার পর খাহেশ বাকী থাকলেও থেমে যাবে এবং পরিমাণ বাড়াবে না।

সারকথা, খাদ্যের বিশেষ পরিমাণ নির্ধারণ সম্ভবপর নয়। কেননা, অবস্থা ও ব্যক্তিভেদে প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা সীমা রয়েছে। তবে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এক দলের অভ্যাস ছিল, তাঁরা সপ্তাহে এক ছা' গম আহার করতেন এবং খেজুর খেলে সপ্তাহে দেড় ছা' খেতেন। চার মুদে এক ছা' হয়। প্রতি মুদ আড়াই পোয়ার সমান। এভাবে এক দিনের খাদ্য হয় গম আধা মুদের কিছু বেশী। খেজুর বেশী হওয়ার কারণ এ থেকে বীচি বের হয়ে যায়। এ পরিমাণটি পেটের এক-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি। হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) রসূলে করীম (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় প্রতি সপ্তাহে তিন সের যব খেতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পরও তাই আহার করতেন। তিনি বলতেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি সারা জীবন এই পরিমাণ বৃদ্ধি করব না। আমি প্রিয় হাবীব (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ কেয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি আমার অধিক নিকটে থাকবে, যে আমৃত্যু বর্তমান অবস্থার উপর কায়েম থাকবে। তিনি কতক সাহাবীর সমালোচনা করতেন এবং বলতেন ঃ তোমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রীতিনীতি বদলে ফেলেছ। এখন যব শোধন করে খাও, চাপাতি রুটি তৈরী কর এবং দুধ, তরকারি ও নানা রকম খাদ্য খাও। পোশাক সকালে এক প্রকার ও বিকালে এক প্রকার পরিধান কর। এগুলো রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে কোথায় ছিল? সুফফাবাসীদের খাদ্য ছিল প্রত্যহ দু'জনের জন্যে তিন পোয়া খোরমা। এতে বীচিও রয়েছে, যা বাদ দেয়ার পর পরিমাণ খুব কম থেকে যেত।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, খাদ্যের সময় নির্দিষ্ট করা; অর্থাৎ একবার খাওয়ার পর কতক্ষণ পর পুনরায় খাবে। এতে তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর, তিন দিন অথবা আরও বেশী সময় খাবে না। কোন কোন সাধক এ ক্ষেত্রে এত সাধনা করেছেন যে, এই মেয়াদ ত্রিশ দিন, চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আলেমগণের মধ্যে অনেকের অবস্থা এরূপ। উদাহরণতঃ মুহাম্মদ ইবনে ওমর ওরফী, আবদুর রহমান ইবনে ইবরাহীম

তায়মী, সোলায়মান খাওয়াস, সহল তস্তরী, ইবরাহীম ইবনে আহমদ খাওয়াস প্রমুখ। হযরত আবু বকর (রাঃ) ছয় দিন নির্দিষ্ট করতেন। সুফিয়ান সওরী ও ইবরাহীম ইবনে আদহাম তিন দিন নির্দিষ্ট করতেন। তাঁরা সকলেই উপদেশ দ্বারা আখেরাতে সাহায্য চাইতেন। জনৈক আলেম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে চল্লিশ দিন কিছু না খায়, তার কাছে কতক খোদায়ী রহস্য উন্মোচিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে, দু' থেকে তিন দিন পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা। এটা অভ্যাস বহির্ভূত নয়; বরং সম্ভবপর। সামান্য চেষ্টা সাধনা করলেই এই স্তর অর্জন করা যায়। তৃতীয় স্তর হচ্ছে, দিন ও রাতের মধ্যে একবার খাবে। এর বেশী হলে তা অপব্যয় হবে। সর্বদা তৃপ্ত অবস্থায় থাকা এবং ক্ষুধা অনুভব না করা বিলাসীদের কাজ, সুন্নত বিরোধী। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সকালে খেলে সন্ধ্যায় খেতেন না এবং সন্ধ্যায় খেলে সকালে খেতেন না। বড় বড় বুযুর্গগণও এ নিয়ম পালন করতেন। তারা দিনে একবার খাদ্য গ্রহণ করতেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেন ঃ

إِيَاك وَالسَّرف فَإِنَّ اَكْلَتَيْنِ فِى كُلِّ يَوْمٍ مِنْ سَرفٍ وَاَكْلَة وَاحِدَةً فِى كُلِّ يَوْمَيْنِ اَقْتَلُ وَاَكْلَةٌ فِى كُلِّ يَوْمٍ قِوَامٌ بَيْنَ ذَالِكَ وَهُوَ الْمَحْمُودُ فِى كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ـ

–'তুমি অপব্যয় থেকে বেঁচে থাক। প্রত্যহ দু'বার খাওয়া অপব্যয়ের মধ্যে দাখিল। প্রত্যেক দু'দিনে একবার খাওয়া মারাত্মক; কিন্তু প্রত্যহ একবার খাওয়া উভয়ের ঠিক মধ্যবর্তী স্তর। আল্লাহর কিতাবে এটা প্রশংসিত।'

অতএব, যে ব্যক্তি দিবারাত্রির মধ্যে একবার খেতে চায়, তার জন্যে তাহাজ্জুদের পর সোবহে সাদেকের পূর্বে অর্থাৎ সেহরীর সময়ে খাওয়া মোস্তাহাব। এতে দিনের বেলায় উপবাস করার কারণে রোযা হয়ে যাবে। এছাড়া রাতেও তাহাজ্জুদের জন্যে উঠা সহজ হবে।

তৃতীয় যে বিষয়টি নির্দিষ্ট করা দরকার, তা হচ্ছে খাদ্যের প্রসার। জানা দরকার, সর্বোত্তম খাদ্য হচ্ছে গমের আটা। এটা শোধিত অবস্থায় পাওয়া গেলে তা স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে দাখিল হয়ে যায়। মধ্যম খাদ্য হচ্ছে যবের শোধিত আটা এবং নিম্নস্তরের খাদ্য যবের অশোধিত আটা। উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন হচ্ছে গোশ্ত ও মিষ্টি, মধ্যম গোশতবিহীন শুরবা এবং

নিম্নস্তরের হচ্ছে লবণ ও সিরকা। অধ্যাত্ম পথের পথিকদের অভ্যাস, তারা কখনও ব্যঞ্জন খান না; মনোলোভা সুস্বাদু খাদ্য থেকেও তারা বিরত থাকেন। কেননা, এতে নফসের আস্ফালন ও কঠোরতা বাড়ে এবং মনে দুনিয়ার আনন্দ ও বিলাস আসন পেতে নেয়। ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ হে সাধকবৃন্দ! যদি জান্নাতের ওলীমা খেতে চাও, তবে দুনিয়াতে নফসকে যত বেশী সম্ভব অনাহারে রাখ। এখানে ক্ষুধা যত বেশী হবে, ততই সেখানকার খাদ্য খাওয়ার খাহেশ বৃদ্ধি পাবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

شِرَارُ اُمَّتِى الَّذِيْنَ غَذُوْا بِالنَّعِيْمِ وَهُيِّئَتْ عَلَيْهِ اَجْسَامُهُمْ وَاِنَّمَا هِمَّتُهُمْ اَلْوَانُ الطَّعَامِ وَاَنْوَاعُ اللِّبَاسِ يَتَشَدَّقُوْنَ فِى الْكَلَامِ ـ

–আমার উম্মতের মধ্যে অসৎ তারা, যারা ধনৈশ্বর্যের মধ্যে লালিত-পালিত এবং এর উপরই বড় হয়। তাদের সাহসিকতা কেবল নানা রকম খাদ্য এবং বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ। তারা গলা ফাটিয়ে কথাবার্তা বলে।

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে এরশাদ করেন ঃ স্মরণ রাখ, তোমাকে কবরে থাকতে হবে। সেখানে অনেক খাহেশ থেকে বঞ্চিত থাকবে। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ সুস্বাদু খাদ্যকে খুব ভয় করতেন এবং একে দুর্ভাগ্যের আলামত মনে করতেন। তাই হযরত ওমর (রাঃ) ঠাণ্ডা পানির শরবত পান করেননি এবং বলতেন ঃ আমাকে এর হিসাবের সাথে জড়িত করো না। হযরত নাফে' (রঃ) বর্ণনা করেন, ইবনে ওমর (রাঃ) একবার অসুস্থ হয়ে টাটকা মাছ খাওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন। মদীনায় অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তা পাওয়া গেল না। কয়েকদিন পর যখন পাওয়া গেল, তখন দেড় দেরহাম দিয়ে কিনে এনে রান্না করা হয়। অতঃপর একটি রুটির উপর মাছটি রেখে হযরত ইবনে ওমরের সামনে পেশ করা হয়। ইতিমধ্যে জনৈক ভিক্ষুক দরজায় এসে হাঁক দিল। হযরত ইবনে ওমর খাদেমকে বললেন ঃ মাছটি রুটিতে জড়িয়ে ভিক্ষুককে দিয়ে দাও। খাদেম আরজ করল ঃ জনাব, অনেক দিন থেকে যখন মাছ খেতে আপনার মন চাইছিল, তখন পাওয়া যায়নি। এখন পাওয়ার পর দেড় দেরহাম দিয়ে কিনে আপনার জন্যে রান্না করেছি। আপনি বললে ভিক্ষুককে এর মূল্য দিয়ে দেই। তিনি বললেন ঃ না, এ মাছটি রুটিতে জড়িয়ে তাকে দিয়ে দাও। অতঃপর খাদেম গিয়ে ভিক্ষুককে বলল ঃ তুমি এটি এক দেরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করবে? ভিক্ষুক সম্মতি দিলে খাদেম এক দেরহাম তাকে

দিয়ে মাছটি আবার তাঁর সামনে হাযির করল এবং বলল ঃ এ মাছটি এক দেরহাম দিয়ে কিনে এনেছি। তিনি বললেন ঃ ভিক্ষুকের কাছ থেকে দেরহাম ফেরত না নিয়ে মাছটি রুটিসহ তাকে দিয়ে এস। আমি রসূলে আকরাম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ

ايما امرء اشتهى شهوة فرد شهوة واثر بها على نفسه غفر الله له -

–যে ব্যক্তির কোন খাহেশ হয়, অতঃপর তাকে বাধা দেয় এবং ত্যাগ স্বীকার করে অন্যকে সমর্পণ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন।

হযরত ওমর (রাঃ) একবার সংবাদ পান যে, ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান নানা রকম খাদ্য আহার করেন। সেমতে তিনি ইয়াযীদের খাদেমকে বললেন ঃ তার রাতের খাদ্য প্রস্তুত হয়ে গেলে আমাকে সংবাদ দিও। খাদেম তাই করল। হযরত ওমর (রাঃ) ইয়াযীদের গৃহে চলে গেলেন। যখন খাদ্য এল, তখন প্রথমে "ছরীদ" (গোশতের শুরুয়া) আনা হল। হযতর ওমরও তার সাথে আহার করলেন। এরপর ভাজা করা গোশত আনা হলে ইয়াযীদ হাত বাড়ালেন; কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) হাত গুটিয়ে নিলেন এবং বললেন ঃ হে ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান! তোমার এখানে এক খাদ্যের পর আরেক খাদ্য হয় নাকি? আল্লাহর কসম, যদি তুমি পূর্ববর্তীদের সুন্নত ছেড়ে দাও, তবে তাদের গোটা তরীকা থেকে তুমি আলাদা হয়ে যাবে। ইয়াসার ইবনে ওমায়র (রঃ) বলেন ঃ আমি কোন দিন হযরত ওমরের জন্যে আটা শোধন করিনি। কখনও করে থাকলে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে করেছি। ওতবা (রাঃ) আটাগুলো রৌদ্রে রেখে দিতেন। শুকিয়ে গেলে খেয়ে নিতেন এবং বলতেন ঃ একখন্ড রুটি ও নিমক খেয়ে থাকা উচিত, যাতে আখেরাতে ভাজা করা গোশত ও উৎকৃষ্ট খাদ্য পাওয়া যায়। তিনি একটি মাটির কলসী থেকে পানি পান করতেন, যা সারাদিন রৌদ্রে পড়ে থাকত। তাঁর বাঁদী বলত ঃ আটা দিয়ে দিলে আমি রুটি তৈরী করে এবং পানি ঠাণ্ডা করে দেব। ওতবা জওয়াবে বলতেন ঃ ক্ষুধার কুকুরকে দমন করা উদ্দেশ্য। সে এভাবেও দমিত হয়ে যায়।

শাকীক ইবনে ইবরাহীম বলেন ঃ একদিন আমি যখন মক্কায় রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর জন্মস্থানের নিকটে অবস্থিত আলইয়াল বাজার দিয়ে গমন করছিলাম, তখন ইবরাহীম ইবনে আদহামকে রাস্তার ধারে বসে ক্রন্দন করতে দেখলাম। আমিও পথ ছেড়ে তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম,

এবং ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ ভাল আছি, যাও। অবশেষে আমি দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ কারও কাছে না বললে বলতে পারি। আমি বললাম ঃ ঠিক আছে, বলব না, আপনি বলুন। তিনি বললেন ঃ তিরিশ বছর ধরে আমার মনে "হারীরা" খাওয়ার সাধ ছিল। কিন্তু আমি সর্বপ্রযত্নে মনকে তা থেকে বিরত রেখেছি। গতকাল রাতে যখন আমি বসে বসে ঝিমুচ্ছিলাম, তখন সবুজ পেয়ালা হাতে এক ব্যক্তি আগমন করল। পেয়ালা থেকে হারীরার সুগন্ধি বের হয়ে এল। আমি সাহস করে নফসকে বাধা দিলাম। লোকটি পেয়ালা আমার নিকটে রেখে বলল ঃ ইবরাহীম, খাও। আমি বললাম ঃ আমি আল্লাহর ওয়াস্তে এটা ছেড়ে দিয়েছি। খাব না। সে বলল ঃ যদি আল্লাহ তাআলাই খাওয়ান, তবে খাওয়া উচিত। আমি এর কোন জওয়াব দিতে পারলাম না এবং কাঁদতে লাগলাম। লোকটি আবার বলল ঃ নাও, খাও। আমি বললাম ঃ খানা কোত্থেকে এল, এ কথা না জানা পর্যন্ত খেতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। সে বলল ঃ খাও, এটা তোমার জন্যে প্রদত্ত হয়েছে। আমাকে আদেশ করা হয়েছে, হে ইসফের, এ পেয়ালাটি নিয়ে যাও এবং ইবরাহীমের নফসকে খাইয়ে দাও। সে অনেক দিন ধরে নফসকে বাধা দিয়ে যাচ্ছে। এখন আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করেছেন। হে ইবরাহীম, স্মরণ রাখ, আমি ফেরেশতাদের মুখে শুনেছি, যে ব্যক্তি দান গ্রহণ করে না, সে পরে তা তালাশ করেও পায় না। আমি বললাম ঃ যদি তাই হয়, তবে আমি তোমার সম্মুখে আছি। এর সমাধান আল্লাহ তাআলাই দেবেন। এরপর আর এক ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হল। সে প্রথম ব্যক্তিকে কিছু দিয়ে বলল ঃ তুমিই আপন হাতে খাইয়ে দাও। সেমতে সে আমার মুখে লোকমা দিতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। জাগ্রত হয়ে আমি মুখে হারীরার স্বাদ অনুভব করলাম।

শাকীক বলেন ঃ ইবরাহীম এ কথা শেষ করতেই আমি বললাম ঃ আপনার হাতটি দেখান তো। আমি তাঁর হাত ধরে চুম্বন করলাম এবং বললাম ঃ হে আল্লাহ্! যাঁরা আপন খাহেশকে পূর্ণরূপে দাবিয়ে রাখে, তুমি তাদের সাধ পূর্ণ করে দাও। তুমিই অন্তরে বিশ্বাস দান কর এবং অন্তরকে প্রশান্ত রাখ। অধম বান্দা শাকীকের প্রতিও কৃপাদৃষ্টি দাও। এরপর শাকীক হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামের হাত আকাশের দিকে উত্তোলন করে বললেন ঃ ইলাহী, এই হাত ও এই হাতের মালিকের বরকতে এবং ইবরাহীমকে প্রদত্ত অনুগ্রহের বরকতে এই মিসকীন বান্দার প্রতি অনুগ্রহ কর। সে তোমারই কৃপা, অনুগ্রহ ও রহমতের মুখাপেক্ষী, যদিও এর

যোগ্য নয়। এরপর তিনি সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে হরম শরীফে প্রবেশ করলেন।

কথিত আছে, মালেক ইবনে দীনার (রঃ) চল্লিশ বছর পর্যন্ত অন্তরে দুধের স্পৃহা নিয়েও দুধ পান করেননি। একদিন তাঁর কাছে খোরমা হাদিয়াস্বরূপ এলে লোকেরা তা খাওয়ার জন্যে তাঁকে পীড়াপীড়ি করল। তিনি বললেন ঃ তোমরাই খেয়ে নাও। আমি চল্লিশ বছর এর স্বাদ গ্রহণ করিনি। তিনি বলেন ঃ আমি পঞ্চাশ বছর ধরে দুনিয়া ত্যাগ করেছি। আমার অন্তর চল্লিশ বছর ধরে দুধ পান করার সাধ পোষণ করে আসছে। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি সারা জীবন তা পান করব না। ক্রীতদাস ওতবা বলেন ঃ সাত বছর পর্যন্ত আমার মন গোশত খাওয়ার খাহেশ করতে থাকে। অবশেষে আমি এই ভেবে লজ্জাবোধ করলাম যে, মনের খাহেশ আর কত মুলতবী রাখব। সাত বছর তো হয়ে গেছে। অতঃপর একদিন একখন্ড গোশ্‌ত নিয়ে ভাজা করলাম এবং তা রুটিতে জড়িয়ে নিলাম। মুখে দেয়ার আগে একটি বালককে দেখে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তুমি কি অমুকের পুত্র নও, যে মারা গেছে? সে বলল ঃ হাঁ। অতঃপর আমি গোশ্‌ত জড়ানো রুটিটি তাকে দিয়ে দিলাম। বর্ণিত আছে, বালকের হাতে রুটি সঁপে দিয়ে তিনি কেঁদে কেঁদে এই আয়াত পাঠ করতে থাকেন—

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ـ

—তারা খাদ্যের মহব্বত সত্ত্বেও মিসকীন, পিতৃহীন এতীম ও বন্দীকে খাদ্য খাওয়ায়।

এরপর তিনি কখনও গোশ্‌ত খাননি।

জাফর ইবনে নসর বলেন ঃ হযরত জুনায়েদ আমাকে কিছু আঞ্জীর ফল কিনে আনতে বললেন। আমি কিনে আনলে তিনি ইফতারের সময় তা মুখে দিলেন এবং সাথে সাথে ফেলে দিলেন। আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ অন্তরের কানে গায়েব থেকে আওয়াজ এসেছে, তুমি আমার খাতিরে এটি ছেড়ে দিয়েছিলে। আবার খাবে?

সালেহ্‌ বলেন ঃ আমি আতা সলমীর খেদমতে আরজ করলাম ঃ আমি আপনার জন্যে একটি বস্তু প্রেরণ করতে চাই। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, আপনি ফেরত দিতে পারবেন না। তিনি বললেন ঃ ভাল কথা। আমি আমার পুত্রের হাতে ঘি ও মধুর সাথে ছাতু মিশ্রিত করে পাঠিয়ে দিলাম এবং বলে দিলাম, যতক্ষণ তিনি না খান, সেখানেই থাকবে। তিনি

খেলেন। এর পরের দিন আমি আবার প্রেরণ করলাম। কিন্তু তিনি না খেয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। সেমতে আমি রাগতস্বরে তাঁকে বললাম ঃ সোবহানাল্লাহ! আপনি আমার হাদিয়া ফেরত দিয়েছেন। তিনি আমাকে রাগ করতে দেখে বললেন ঃ রাগের কোন কথা নেই। একবার তো আমি তোমার আবদার রেখেছি। দ্বিতীয় বার যখন তুমি প্রেরণ করলে তখন আমি অনেক খেতে চেয়েছি, কিন্তু সম্ভব হয়নি। যখনই আমি খাওয়ার ইচ্ছা করতাম তখনই এ আয়াত মনে পড়ে যেত— يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ চুমুক দেয় এবং গলাধঃকরণ করতে পারে না। সালেহ্‌ বলেন ঃ আমি কেঁদে কেঁদে বললাম ঃ হায়! আমি এক জায়গায় এবং আপনি অন্য জায়গায় আছেন।

জনৈক আবেদ তাঁর এক আপনজনকে দাওয়াত করে এনে কয়েকটি রুটি সামনে রেখে দিলেন। লোকটি রুটিগুলো ওলট-পালট করে খাওয়ার জন্যে ভাল রুটি বেছে নিতে লাগল। আবেদ বললেন ঃ এ কি করছ? তুমি জান না, যে রুটিটি তুমি বাদ দিয়েছ, সেটি কতজন কারিগরের হাত হয়ে তোমার কাছে এসেছে। প্রথমে মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। বৃষ্টি দ্বারা মৃত্তিকা ও চতুষ্পদ জন্তু সতেজ হয়েছে। অনেক মানুষে কাজ করেছে। এরপর এ রুটি তোমার কাছে এসেছে। এখন তুমি ওলট-পালট করছ এবং খাওয়ায় আগ্রহ দেখাচ্ছ না। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

لَايَسْتَدِيرُ الرَّغِيفُ وَيُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْكَ حَتَّى يَعْمَلَ فِيهِ ثَلَاثَ مِاءَةٍ وَسِتُّونَ صَانِعًا اَوَّلُهُمْ مِيْكَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِى يَكِيلُ الْمَاءَ مِنْ خَزَائِنِ الرَّحْمَةِ ثُمَّ الْمَلَائِكَةُ الَّتِى تَزْجِى السَّحَابَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْاَفْلَاكُ وَمَلَائِكَةُ ـ

—রুটি গোলাকার হয়ে তোমার সামনে আসে না যে পর্যন্ত তাতে তিন'শ ষাট জন কারিগর কাজ না করে। প্রথম কারিগর হচ্ছে মীকাঈল (আঃ), যে পানিকে রহমতের ভাণ্ডার থেকে মেপে দেয়। এরপর সেই সকল ফেরেশতা, যারা মেঘমালা হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। এরপর রয়েছে সূর্য, চন্দ্র এবং আকাশের ফেরেশতাকুল। সর্বশেষ কারিগর হচ্ছে রুটি প্রস্তুতকারী। যদি তুমি আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ গণনা কর, তবে শেষ করতে পারবে না।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি কাসেম জাওরীর কাছে যেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বৈরাগ্য কি? তিনি বললেন ঃ তুমি এ সম্পর্কে কি শুনেছ? আমি

কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করলে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমি বললাম ঃ এ সম্পর্কে আপনার উক্তি কি? তিনি বললেন ঃ উদর হচ্ছে মানুষের দুনিয়া। একে যতটুকু নিয়ন্ত্রণ করবে ততটুকু বৈরাগ্য অর্জিত হবে এবং যে পরিমাণ একে বাধা না দেবে, সেই পরিমাণ তুমি দুনিয়ার করায়ত্ত হয়ে যাবে।

এসব গল্প থেকে জানা গেল, আমাদের বর্ণিত উপকারিতাসমূহ অর্জনের উদ্দেশেই বুযুর্গগণ খাহেশ থেকে বিরত রয়েছেন এবং উদরপূর্তি করে আহার বর্জন করেছেন। মাঝে মাঝে এর কারণ এটাও ছিল যে, তাঁরা খাদ্যদাতার রুযী হালাল ও স্বচ্ছ মনে করতেন না। জানা উচিত, মন যা চায় তাই প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত নয়। আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ লবণও খাহেশ বা কামনার বস্তু। কারণ, এটা রুটির অতিরিক্ত। রুটির অতিরিক্ত সবকিছুই বাড়তি এবং খাহেশের মধ্যে দাখিল। এটা চূড়ান্ত নীতি। কেউ এতে সক্ষম না হলে তার উচিত কমপক্ষে আপন নফস সম্পর্কে গাফেল এবং খাহেশের মধ্যে নিমজ্জিত না হওয়া। যা মনে চায়, তাই খাওয়া এবং যা খুশী তাই করা অপব্যয়ের জন্যে যথেষ্ট। তাই বিরতিহীনভাবে গোশত ভক্ষণ ত্যাগ করা উচিত। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত গোশত বর্জন করে, সে বদস্বভাব হয় এবং যে চল্লিশ দিন অবিরত গোশত খায়, সে কঠোর প্রাণ হয়ে যায়। সার কথা, নফসকে বৈধ খাদ্যসামগ্রীর খাহেশের মধ্যেও ফেলা উচিত নয়। যদি কেউ দুনিয়াতে সকল খাহেশ পূর্ণ করে নেয়, তবে কেয়ামতে তাকে বলা হবে أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ পার্থিব জীবনেই তোমরা তোমাদের মজা নিঃশেষ করে দিয়েছে এবং ভোগ করে নিয়েছ। (এখন কি চাও?)

দুনিয়াতে নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ করে যে পরিমাণ খাহেশ বর্জন করা হবে, আখেরাতে সেই পরিমাণ লোভনীয় সামগ্রী পাওয়া যাবে। বসরার জনৈক বুযুর্গ বিশ বছর পর্যন্ত চাউলের রুটি ও মাছ খাওয়ার সাধ পোষণ করতে থাকেন; কিন্তু নফসের উপর মোজাহাদা করে নিজেকে তা থেকে বিরত রাখেন। ওফাতের পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল ঃ আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন ঃ যেসকল নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছি, সেগুলো বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই। সর্বপ্রথম আমাকে যা দেয়া হয়েছে, তা ছিল চাউলের রুটি ও মাছ। আমাকে বলা হয়েছে– আজ যে পরিমাণ ইচ্ছা বেহিসাব খেয়ে নাও। আল্লাহ স্বয়ং বলেন ঃ

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ـ

–স্বচ্ছন্দে খাও ও পান কর, বিগত দিনে যা পাঠিয়েছিলে তার কারণে।

এ কারণেই আবু সালমান (রহঃ) বলেন ঃ একটি খাহেশ ত্যাগ করা এক বছর রোযা রাখা ও রাত্রি জাগরণ অপেক্ষা অধিক উপকারী। আল্লাহ আমাদেরকেও মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওসিলায় স্বীয় সন্তুষ্টির তওফীক দান করুন।

৪ ॥ ক্ষুধা ও তার ফযীলতে মিতাচার

জানা উচিত, সকল অবস্থা ও চরিত্রের মধ্যে মধ্যবর্তিতাই চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং স্বল্পতা ও বাহুল্য নিন্দনীয়। ক্ষুধার ফযীলত সম্পর্কে আমরা যা কিছু লিখে এসেছি, এতে কেউ যেন মনে না করে যে, এর বাহুল্যই উদ্দেশ্য। আসল কথা হচ্ছে, মানুষের মন যে সকল বস্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে কামনা করে এবং তাতে কিছু অনিষ্ট থাকে, সেখানে শরীয়ত অতিমাত্রায় নিষেধবাণী উচ্চারণ করে, যাতে মূর্খরা বুঝে নেয় যে, সর্বাবস্থায় বিষয়টি থেকে বেঁচে থাকাই উদ্দেশ্য এবং যথাসম্ভব মনের চাহিদার বিপরীত আমল করা লক্ষ্য। কিন্তু বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তি বুঝে নেয়, মিতাচারের স্তরই কাম্য। উদাহরণতঃ অত্যধিক উদরপূর্তি কোন মনের চাহিদা হলে শরীয়ত তার সামনে পূর্ণমাত্রায় ক্ষুধার গুণ ও প্রশংসা বর্ণনা করে, যাতে মন কোনরূপে তার চাহিদা থেকে বিরত থেকে মিতাচারের স্তর অর্জন করে নেয়। কেননা, মনের চাহিদার সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন সম্ভবপর নয়। অতএব এমন কোন সীমা অবশ্যই থাকা দরকার, যার আমল শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় হবে। উদাহরণতঃ রাত্রি জাগরণ ও রোযা সম্পর্কে শরীয়তে অতিমাত্রায় গুণকীর্তন করা হয়েছে। কিন্তু যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) জানলেন, কিছু সংখ্যক লোক সদাসর্বদা রোযা রাখে এবং সারারাত জেগে নামায পড়ে, তখন তিনি তাদেরকে নিষেধ করে দিলেন। এ থেকে জানা গেল, উদ্দেশ্য কেবল সমতার স্তর। সুতরাং খাওয়ার ব্যাপারে উত্তম ও মিতাচার হচ্ছে, এতটুকু খাবে, যদ্দ্বারা পাকস্থলী ভারী না হয় এবং ক্ষুধার কষ্ট অনুভূত না হয়। কেননা, খাদ্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবন রক্ষা করা এবং এবাদতের শক্তি অর্জন করা। পাকস্থলী ভারী হয়ে গেলে যেমন এবাদত হতে পারে না, তেমনি ক্ষুধার কষ্টও অন্তরের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অতএব এমনভাবে খাবে যাতে খাদ্যের বোঝা অনুভূত না হয়, যাতে ফেরেশতাদের অনুরূপ হওয়া যায়। ফেরেশতাদেরও খাদ্যের বোঝা ও

ক্ষুধার কষ্ট মালুম। তাদের অনুসরণ করাই মানুষের জন্যে পূর্ণতার স্তর। ভোজনে তৃপ্তি ও ক্ষুধা থেকে কেউ নিষ্কৃতি পেতে পারে না। তাই উভয় অবস্থা থেকে অধিকতর দূরবর্তী স্তরটিই মধ্যবর্তী স্তর, যাকে সমতা বলা হয়। স্বল্পতা ও বাহুল্য থেকে মধ্যবর্তী স্তরে ফিরে যাওয়া এমন, যেমন লোহার একটি উত্তপ্ত বৃত্তকে মাটিতে রেখে একটি পিঁপড়াকে তার মধ্যস্থলে ছেড়ে দিলে পিঁপড়াটি বৃত্তের উত্তাপ থেকে আত্মরক্ষা করতে চতুর্দিক দিয়ে বের হয়ে যেতে চাইবে। কিন্তু সকল দিকেই উত্তাপ বিদ্যমান। সে কোন দিক দিয়ে বের হতে পারবে না এবং ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করতে থাকবে। অবশেষে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধে পৌঁছে থেমে সে সকল দিকের উত্তাপ থেকে অধিকতর দূরত্বে থাকবে। এমনিভাবে খাহেশও মানুষকে চতুর্দিক বেষ্টন করে রয়েছে। মানুষ পিঁপড়ার মত তার বৃত্তের মধ্যে পড়ে আছে। এই বৃত্ত অতিক্রম করে বের হয়ে যাওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব। অথচ মানুষ ফেরেশতাদের অনুরূপ হতে চায়। এটা তখনই সম্ভব, যখন মানুষ খাহেশ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকে। সমতা সকল দিক থেকে সমান দূরে বিধায় সকল অবস্থা ও চরিত্রে সমতাই কাম্য হওয়া উচিত। নিম্নোক্ত হাদীসে এই সমতাই উদ্দেশ্য خَيْرُ الْأُمُوْرِ أَوْسَطُهَا মধ্যবর্তী বিষয়ই সর্বোত্তম। নিম্নোক্ত আয়াতেও এই সমতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا

–খাও, পান কর এবং অপচয় করো না।'

সুতরাং মানুষ যখন ক্ষুধা ও তৃপ্তি উভয়টি অনুভব করবে, তখন নফস হালকা থাকবে, এবাদত ও চিন্তা ভাবনা সহজ মনে হবে এবং আমল করতে সক্ষম হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে নফস অবাধ্য, খাহেশের প্রতি আগ্রহী এবং বাহুল্যের প্রতি ঝুঁকে থাকে বিধায় সমতা অর্জন করা সহজ হয় না এবং এতে কোন উপকারও হয় না। তখন বরং ক্ষুধা দ্বারা তাকে অধিক মাত্রায় পীড়িত করা উচিত; যেমন ঘোড়াকে পোষ মানানোর জন্যে প্রথম তাকে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রাখা হয় এবং খুব কষাঘাত করা হয়। এরপর ঘোড়া পোষ মানে এবং প্রভুর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে। পোষ মানার পর ঘোড়াকে সকল কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়ে সমতার পর্যায়ে ছেড়ে দেয়া হয়। এই রহস্যের ভিত্তিতেই মুরশিদ মুরীদকে এমন কাজ করতে বলে, যা সে নিজে করে না। উদাহরণতঃ সে মুরীদকে ক্ষুধার্ত থাকতে অথবা খাহেশ বর্জন করতে আদেশ করে; অথচ সে নিজে ক্ষুধার্ত এবং খাহেশ থেকে

সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে না। কেননা, সে আপন নফসের সংশোধন সমাপ্ত করেছে। এখন নফসকে কষ্ট দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। অধিকাংশ অবস্থায় নফস খাহেশের পূজারী, দুষ্ট, অবাধ্য ও এবাদতবিমুখ হয় বিধায় তাকে ক্ষুধার্ত রাখাই সমীচীন। দুব্যক্তিই সর্বদা ক্ষুধার্ত থাকা হতে বিরত থাকে। এক, সিদ্দীক; তার ক্ষুধার্ত থাকার প্রয়োজন নেই; কারণ তার নফস সৎপথে প্রতিষ্ঠিত । দুই, নির্বোধ; সে নিজেকে সিদ্দীক মনে করে সংশোধনের উপযুক্ত মনে করে না। এটা একটা বড় ধোঁকা বৈ কিছু নয়। সে প্রায়ই কোন সিদ্দীককে এ ব্যাপারে পরওয়া না করতে দেখে নিজেও তেমনি করতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন রুগ্ন ব্যক্তি জনৈক রোগমুক্ত সুস্থ ব্যক্তিকে কোন বস্তু খেতে দেখে। এরপর সেও নিজেকে সুস্থ মনে করে সেই বস্তু খেয়ে ফেলে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর জন্যেও খাদ্যের পরিমাণ এবং সময় নির্দিষ্ট ছিল না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি এত বেশী রোযা রাখতেন যে, আমরা মনে করতাম, বোধ হয় আর কখনও রোযা ছাড়বেন না। আবার কখনও রোযাবিহীন দিন এত বেশী হত যে, আমরা ধারণা করতাম, বোধ হয় আর কোন দিন রোযা রাখবেন না। তিনি গৃহে পৌঁছে খাবার আছে কি না জিজ্ঞেস করলে যদি "হাঁ" বলা হত, তবে খেয়ে নিতেন। নতুবা বলতেন ঃ আজ তো আমি রোযা রেখেছি। এমনিভাবে তাঁর সামনে কোন খাদ্য পেশ করা হলে তিনি বলতেন ঃ আমি তো রোযা রাখতে চেয়েছিলাম। আচ্ছা, নিয়ে এস। সহল তস্তরীকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ শুরুতে আপনার অবস্থা কিরূপ ছিল? জওয়াবে তিনি অভাবনীয় কষ্ট করার কথা উল্লেখ করলেন। এমনকি, তিনি বললেন ঃ দীর্ঘ দিন আমি বড়ই গাছের পাতা খেয়ে জীবন যাপন করেছি। তিন বছর ডুমুর ফল চূর্ণ করে খেয়েছি এবং তিন বছরে তিন দেরহামের খাদ্য খেয়েছি। এরপর তাঁকে প্রশ্ন করা হল ঃ বর্তমানে আপনার খাদ্য কি? তিনি বললেন ঃ এখন কোন সীমা ও সময় নির্দিষ্ট নেই। এর অর্থ এই নয় যে, এখন অনেক খাই। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, খাওয়ার কোন পরিমাণ ও সময় নির্দিষ্ট নেই। যে সময় যে পরিমাণ জরুরী এবং সমীচীন মনে করি, খেয়ে নেই।

হযরত মারুফ কারখীর কাছে লোকেরা উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রেরণ করত। তিনি খেয়ে নিতেন। লোকেরা বলল ঃ আপনার ভাই বশীর এরূপ খাদ্য খান না। তিনি বললেন ঃ বশীরকে পরহেযগারী বাধা দেয়। আমাকে মারেফত প্রশস্ত করে রেখেছে। তিনি আরও বললেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র

মেহমান। তিনি যখন খাওয়ান, খেয়ে নেই। যখন উপবাস রাখেন, সবর করি। আমার ওযর আপত্তি করার প্রয়োজন কি?

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম একদিন অনেক প্রকারের খাদ্য তৈরী করিয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দাওয়াত করেন। তাঁদের মধ্যে আওযায়ী এবং সুফিয়ান সওরীও ছিলেন। খাদ্য সামগ্রীর আড়ম্বর দেখে সুফিয়ান সওরী বললেন ঃ হে আবু ইসহাক, আপনি কি অপব্যয়ের আশংকা করেন না? ইবরাহীম বললেন ঃ খাদ্যের মধ্যে অপব্যয় হয় না। পোশাক-পরিচ্ছদ ও গৃহের আসবাবপত্রের মধ্যে অপব্যয় হয়।

অতএব যে ব্যক্তি শুনে ও অনুকরণ করে জ্ঞান অর্জন করে, সে প্রকৃত কারণ বুঝে না। সে ইবরাহীম ইবনে আদহামের এই অবস্থা শুনে; আবার মালেক ইবনে দীনারের এই অবস্থা দেখে যে, তাঁর গৃহে বিশ বছর পর্যন্ত নিমক আসেনি। আবার সিররী সকতী সম্পর্কে সে পাঠ করে যে, তাঁর নফস চল্লিশ বছর পর্যন্ত আঙ্গুরের নির্যাস খাওয়ার সাধ পোষণ করে; কিন্তু তিনি তা খাননি। এসব শুনে ও পাঠ করে এ ব্যক্তি এগুলোর মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা দেখতে পায়। সে হয়রান হয়ে বিশ্বাস করতে থাকে, এই বুযুর্গগণের মধ্যে কেউ না কেউ নিশ্চিতই ভ্রান্ত ছিলেন। কিন্তু যে চক্ষুষ্মান ব্যক্তির সামনে জ্ঞানের সকল রহস্য উন্মোচিত, সে জানে, সকলেই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তবে অবস্থা ও সময়ভেদে তাঁদের আমল বিভিন্নরূপ ছিল। এসব বিভিন্ন অবস্থা শুনে সাবধানী ব্যক্তি বুঝে নেয়, সে মারেফতের স্তরে পৌঁছেনি। তাই এই বুযুর্গানের মত বেপরওয়া হওয়া তার উচিত নয়। তার নফস মালেক ইবনে দীনার অথবা সিররী সকতীর নফসের মত আনুগত্যশীল নয়, যাঁরা পার্থিব আনন্দ বিসর্জন দিয়েছিলেন। ফলে সে তাঁদেরই অনুসরণ করতে থাকে। পক্ষান্তরে দাম্ভিক অহংকারী ব্যক্তি এভাবে চিন্তা করে– আমার নফস ইবরাহীম ইবনে আদহাম ও মারুফ কারখীর নফস অপেক্ষা অধিক নাফরমান নয়। অতএব আমিও তাঁদের অনুসরণ করে খাদ্যের নিয়মনীতি শিকায় তুলে রাখব। আমিও আল্লাহর মেহমান। সুতরাং বাছবিচারের প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে নির্বোধদের সাথে সাথে শয়তানেরও অনেক দখল আছে। খাদ্য গ্রহণ করা না করা এবং শখের বস্তু খাওয়া না খাওয়া কেবল এমন ব্যক্তির জন্যেই শোভনীয়, যে বেলায়েত ও নবুওয়তের নূর দ্বারা দেখে। এই নূর তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ নফসের খাহেশ থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং অভ্যাসের দাসত্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে সে যখন খায়, তখনও তাতে কোন মহৎ নিয়ত থাকে এবং যখন না খায়,

তখনও তা নিয়ত থেকে খালি হয় না। এমতাবস্থায় খাওয়া না খাওয়া উভয়টি আল্লাহর ওয়াস্তে হবে। এ ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ)-এর সাবধানতা দৃষ্টির সামনে রাখা উচিত। তাঁর জানা ছিল, রসূলে আকরাম (সাঃ) মধু পছন্দ করতেন এবং তা সাগ্রহে খেতেন। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) আপন নফসকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নফসের অনুরূপ মনে করেননি। ফলে লোকেরা যখন তাঁর সামনে মধুর ঠাণ্ডা শরবত পেশ করল, তখন তিনি পাত্রটি আপন হাতের মধ্যে ঘুরাচ্ছিলেন আর বলছিলেন ঃ এটা পান করলে এর স্বাদ কিছুক্ষণের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে; কিন্তু এর হিসাব নিকাশ বাকী থেকে যাবে। এরপর 'আমি পান করব না' বলে পাত্রটি ফিরিয়ে দিলেন। মুরীদকে এসব রহস্য সম্পর্কে অবগত না করাই মুরশিদের উচিত। তাকে কেবল ক্ষুধার্ত থাকতে বলবে এবং সমতার কথাও বলবে না। কারণ, সে সমতা অর্জন করতে কিছু ত্রুটি করবে। সুতরাং চূড়ান্ত পর্যায়ের ক্ষুধার কথা বললে কমপক্ষে সমতা অর্জিত হয়ে যাবে। এ কথাও মুরীদকে বলবে না যে, কামেল সাধক সাধনা থেকে মুক্ত ও বেপরওয়া হয়ে যায়। এতে শয়তান সর্বক্ষণ তাকে কুমন্ত্রণা দেবে– তুমি তো কামেল হয়ে গেছ। এতে কোন ত্রুটি নেই। সবই অর্জিত হয়ে গেছে। হযরত ইবরাহীম খাওয়াস মুরীদকে সাধনা করতে বললে নিজেও তার সাথে সাধনা করতেন, যাতে সে মনে না করে যে, নিজে তো কিছু করেন না, আমাকে করতে বলেন।

প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে সমতা কোন্‌টি, তা এক গোপন বিষয়। তাই কোন অবস্থাতেই যেন সাবধানতা হাতছাড়া না হয়। হযরত ওমর (রাঃ) একবার আপন পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে দেখলেন, সে গোশত ও ঘি রুটির সাথে খাচ্ছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে দোররা দিয়ে মারলেন এবং বললেন ঃ কোন দিন দুধ দিয়ে, কোন দিন ঘি দিয়ে, কোন্‌দিন তেল দিয়ে, কোন্‌দিন লবণ দিয়ে এবং কোন দিন কোন কিছু ছাড়াই শুকনো রুটি খাবে। এ থেকে সমতা কাকে বলে জানা গেল। সব সময় গোশত এবং খাহেশের বস্তু খাওয়া বাহুল্য ও অপব্যয়ের মধ্যে দাখিল। পক্ষান্তরে গোশত সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা স্বল্পতা ও দীনতার মধ্যে গণ্য। মাঝে মাঝে খেয়ে নেয়া মধ্যবর্তী স্তর ও সমতা।

রিয়ার বিপদাপদ

জানা উচিত, খাহেশ বর্জনকারী ব্যক্তি এমন দু'টি বিপদের সম্মুখীন হয়, যা সাধের বস্তু খাওয়ার চেয়েও অধিক ক্ষতিকর। প্রথম হচ্ছে, নফস

কোন কোন খাহেশ ত্যাগ করতে পারে না। কিন্তু কেউ জানুক, এটাও চায় না। তাই নির্জনে সে বস্তুটি খেয়ে নেয়– জনসমাবেশে খায় না। একে বলা হয় "শেরকে খফী" তথা গোপন শেরক। জনৈক আলেমকে কোন দরবেশের হাল জিজ্ঞেস করা হলে তিনি চুপ করে রইলেন। লোকেরা বলল ঃ তার কোন দোষ আপনি জানেন? তিনি বললেন ঃ সে একান্তে এমন বস্তু খায়, যা প্রকাশ্যে খায় না। মোট কথা, এটা খুব বড় বিপদ। কেউ খাহেশের মহব্বতে লিপ্ত হয়ে গেলে তার উচিত তা প্রকাশ করে দেয়া। 'সাচ্চা হাল' একেই বলা হয়। এতে শুধু এটাই জানা যাবে যে, আমলের দোষে সাধনা ভণ্ডুল হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে কোন দোষ গোপন করে তার বিপরীতে জনসমক্ষে পূর্ণতা প্রকাশ করলে দু'টি ক্ষতি হবে; যেমন মিথ্যা বলে তা গোপন করলে দু'টি মিথ্যা হয়ে যায়। দু'টি সত্যিকার তওবা না করা পর্যন্ত কেউ এরূপ ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হয় না। এ কারণেই আল্লাহ পাক মোনাফেকদের আযাব বেশী বলে এরশাদ করেছেন। কেননা, কাফের প্রকাশ্যে কুফর করে; কিন্তু মোনাফেক কুফর করে তা গোপন করে। অতএব গোপন করা দ্বিতীয় কুফর হল। সে মানুষের দৃষ্টিকে আল্লাহর দৃষ্টির চেয়ে অধিক প্রখর বলে বিশ্বাস করে আপন কুফর গোপন করে। তাই সে দ্বিগুণ আযাবের যোগ্য হয়। বিভুজ্ঞানীগণ খাহেশ এমনকি, গোনাহে লিপ্ত হয়ে যান; কিন্তু রিয়ায় গ্রেফতার হন না। তাঁরা আপন দোষত্রুটি গোপন করেন না; বরং পূর্ণ বিভুজ্ঞান হচ্ছে, খাহেশকে আপন নফস থেকে আল্লাহর ওয়াস্তে দূর করবে এবং বাহ্যতঃ মানুষের বিশ্বাস হ্রাস করার জন্যে খাহেশ প্রকাশ করবে। জনৈক বুযুর্গ সাধের মামুলী বস্তু এনে গৃহে লটকিয়ে রাখতেন; অথচ খেতেন না, যাতে গাফেল লোক তাঁর কাছে এসে ভিড় না জমায় এবং তাঁকেও খাহেশ পূজারী মনে করে। দরবেশের বড় কৃতিত্ব হচ্ছে দরবেশীতে দরবেশী করা; অর্থাৎ দরবেশীর বিপরীত প্রকাশ করা। এটা সিদ্দীকগণের কাজ। এরূপ ব্যক্তি সেই ব্যক্তির মত, যাকে কেউ কিছু দিলে প্রকাশ্যে তা গ্রহণ করে; কিন্তু পরে গোপনে মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়। বলাবাহুল্য, তার অন্তর দু'বার বিনয়ী হয়। এক, বাহ্যতঃ গ্রহণ করার লাঞ্ছনা মেনে নেয়ার সময় এবং দুই, গোপনে ফেরত দেয়ার কালে আপন অভাব অব্যাহত রাখার সময়। এই স্তর অর্জিত হওয়া পর্যন্ত নিজেকে অপূর্ণ জ্ঞান করা এবং খাহেশ প্রকাশ করা উচিত। শয়তান তাকে এই বলে ধোকা দিতে চাইবে যে, এ খাহেশ প্রকাশ করলে অন্যেরাও তোমার অনুসরণ করবে। সুতরাং গোপন করার মধ্যেই অপরের সংশোধন

নিহিত। অথচ বাস্তবে অপরের সংশোধন লক্ষ্য হলে আপন নফসের সংশোধন অগ্রে এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ হত। এতে বুঝা গেল, উদ্দেশ্য রিয়া ছাড়া কিছুই নয়।

দ্বিতীয় বিপদ হচ্ছে, খাহেশ বর্জনে সক্ষম; কিন্তু সাধু বলে পরিচিতি হওয়ার আকাঙ্ক্ষী। এমতাবস্থায় খাদ্যের খাহেশ, যা আসলে দুর্বল, তা তো বর্জন করা হল; কিন্তু সুখ্যাতির খাহেশ, যা অধিক অনিষ্টকর– তার খপ্পরে পড়া হল। একে বলা হয় গোপন খাহেশ। এটা খাদ্যের খাহেশ অপেক্ষা অধিক জোরালো। কেউ নিজের মধ্যে এ ধারার খাহেশ অনুভব করার পর যদি একে অধিক জোরালো মনে করে খাদ্যের খাহেশ মিটিয়ে নেয় এবং খেয়ে ফেলে, তবে এটা তার জন্যে উত্তম। হযরত আবু সোলায়মান বলেন ঃ তোমার সামনে যখন বর্জন করা সাধের খাদ্য আসে, তখন তা থেকে সামান্য খেয়ে নাও, নফসের চাহিদা মোতাবেক খেয়ো না। এতে দু'টি উপকারিতা আছে। এক, খাহেশ থাকবে না এবং দুই, নফস আকাঙ্ক্ষার মধ্যে থেকে যাবে। হযরত ইমাম জাফর (রহঃ) বলতেন ঃ আমার সামনে কোন খাহেশের বস্তু এলে আমি আপন নফসকে দেখি। যদি প্রকাশ্যে আকাঙ্ক্ষা করতে দেখি, তবে খাইয়ে দেই। বাধা দেয়ার চেয়ে এটা ভাল। আর যদি দেখি, গোপনে আকাঙ্ক্ষা করে এবং প্রকাশ্যে বর্জনকারী হতে চায়, তবে খাওয়া বর্জন করি– কখনও খাই না। এ থেকে গোপন খাহেশের জন্যে নফসকে সাজা দেয়ার পদ্ধতি জানা গেল। মোট কথা, খাদ্যের খাহেশ ত্যাগ করে গোপন খাহেশে লিপ্ত হওয়া এমন, যেমন কেউ বিচ্ছুকে ভয় করতঃ সাপের কাছে চলে যায়। কেননা, রিয়ার ক্ষতি খাদ্যের খাহেশের ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশী।

লজ্জাস্থানের খাহেশ

প্রকাশ থাকে যে, দুটি উপকারিতা অর্জনের জন্যে মানুষকে স্ত্রী সহবাসের খাহেশে লিপ্ত করা হয়েছে। প্রথম হচ্ছে এর দ্বারা আনন্দ ও সুখ লাভ করে মানুষ পরকালের আনন্দ এবং সুখ স্মরণ করবে। কেননা, এই আনন্দ ও সুখ দীর্ঘস্থায়ী হলে দেহের আনন্দসমূহের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী হত; যেমন অগ্নি সর্বাধিক কষ্ট দায়ক। ফলে এই আনন্দ মানুষকে জান্নাতের জন্যে আগ্রহান্বিত করত। জান্নাতের আগ্রহ দোযখের ভয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কষ্ট ছাড়া সম্ভবপর নয়। অতএব দুনিয়াতে যখন কেউ স্ত্রী সহবাসের আনন্দ ও সুখ উপভোগ করবে, তখন জেনে নেবে যে, জান্নাতের সুখও এমনি ধরনের অথবা এর চেয়েও

উৎকৃষ্ট। দ্বিতীয় উপকারিতা হচ্ছে, পৃথিবীতে মানুষের বংশ পরম্পরা অব্যাহত রাখা। এ দু'টি উপকারিতা ছাড়া এই খাহেশের মধ্যে বিপদাপদ ও অপকারিতা এত বেশী যে, মানুষ একে নিয়ন্ত্রণ করে সমতার পর্যায়ে না রাখলে তার দ্বীন দুনিয়া উভয় বরবাদ হয়ে যায়।

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ـ

–পরওয়ারদেগার, আমাদেরকে এমন বোঝা দিয়ো না, যার শক্তি আমাদের নেই।

এই আয়াতের তফসীরে কেউ কেউ লেখেন, এখানে "শক্তির অধিক বস্তু" বলে সহবাসের তীব্র খাহেশ বুঝানো হয়েছে। এতে সন্দেহ নেই যে, মানুষের এই খাহেশ যখন উত্তেজিত হয়ে উঠে, তখন তার দুই তৃতীয়াংশ জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পায়। রসূলে করীম (সাঃ) দোয়ায় বলতেন ঃ

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَبَصَرِي وَقَلْبِي وَمَنِيِّي

–আল্লাহ, তোমার কাছে আশ্রয় চাই আমার কান, চক্ষু অন্তর ও বীর্যের অনিষ্ট থেকে।

তিনি আরও বলেন ঃ

اَلنِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ وَلَوْ لَا هٰذِهِ الشَّهْوَةُ لَمَا كَانَتِ النِّسَاءُ سُلْطَنَةً عَلَى الرِّجَالِ ـ

–নারী শয়তানের জাল। এই খাহেশ না থাকলে নারীরা পুরুষদের উপর রাজত্ব করতে পারত না।

বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ) এক মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় ইবলীস আগমন করল। তার মস্তকে বহুরঙ্গের চাকচিক্যময় টুপি। মূসা (আঃ)-এর নিকটবর্তী হয়ে সে টুপি খুলে রেখে দিল। অতঃপর সালাম করল। মূসা (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কে? সে আরজ করল ঃ আমি ইবলীস। তিনি বললেন ঃ তোমার মৃত্যু হোক, এখানে আসার কারণ কি? ইবলীস বলল ঃ আল্লাহর কাছে আপনার বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। তাই আপনাকে সালাম করতে এসেছি। মূসা (আঃ) বললেন ঃ আচ্ছা, বল তো, মানুষ কি কাজ করলে তুমি তার উপর প্রবল হয়ে যাও? ইবলীস আরজ করল ঃ যখন মানুষ নিজেকে বড় এবং গোনাহ ভুলে গিয়ে নিজের আমলকে বেশী মনে করতে থাকে, তখন সে আমার করায়ত্ত হয়ে যায়। আমি আপনাকে দুইটি বিষয়ে সতর্ক করছি। প্রথম, বেগানা নারীর সাথে নির্জনে যাবেন না। কেননা, যে পুরুষ বেগানা নারীর

সাথে একান্তে থাকে, আমি স্বয়ং সেখানে যাই, চেলাদেরকে পাঠাই না। এরপর এই পুরুষকে কুকর্মে লিপ্ত করে দেই। দ্বিতীয়, আল্লাহর সাথে যে অঙ্গীকার করেন তা পূর্ণ করুন এবং যাকাত ও সদকার জন্যে নির্দিষ্ট মাল বণ্টন করে দিন। কারণ, মানুষ খয়রাতের জন্যে যে অর্থ আলাদা করে, আমি তাতেও নানা জটিলতা সৃষ্টি করি, যাতে সে তার নিয়ত পূর্ণ করতে না পারে। এরপর ইবলীস চলে গেল। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, পূর্বকালে প্রেরিত সকল নবী সম্পর্কেই শয়তান আশা করত যে, নারীর ফাঁদে ফেলে তাঁদেরকে ধ্বংস করে দেবে। আমার কাছেও নারীর চেয়ে অধিক বিপজ্জনক কোন কিছু নেই। তাই আমি মদীনা মুনাওয়ারায় আপন গৃহ ছাড়া কারও গৃহে যাই না অথবা আপন কন্যার গৃহে জুমুআর দিন কেবল গোসল করতে যাই। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ শয়তান নারীকে বলে, তুমি আমার অর্ধেক বাহিনী। তুমি আমার তীর, যা কখনও লক্ষ্যভেদ করতে ব্যর্থ হয় না। তুমি আমার রহস্য। তুমি আমার দারোয়ান ও দূত। অর্থাৎ শয়তানের অর্ধেক বাহিনী হচ্ছে খাহেশ এবং অর্ধেক বাহিনী ক্রোধ। কিন্তু নারীর খাহেশ হচ্ছে সর্ববৃহৎ। এই খাহেশের তিনটি স্তর আছে- স্বল্পতা, বাহুল্য ও সমতার স্তর। বাহুল্য হচ্ছে, নারীর প্রতি এমন খাহেশ হওয়া যে, জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পায়, সাধনা ও আখেরাতের পথ থেকে বঞ্চিত করে দেয় অথবা দ্বীনদার পশ্চাতে ফেলে কুকর্মে লিপ্ত করে দেয়। এই পর্যায়ের খাহেশ অত্যন্ত নিন্দনীয়। স্বল্পতার স্তর হচ্ছে পুরুষত্বহীন হয়ে যাওয়া। এটাই নিন্দাযোগ্য ও খারাপ। সমতার স্তর হচ্ছে প্রশংসনীয়। তা হল, নারীর খাহেশ সর্বদা জ্ঞান-বুদ্ধি ও শরীয়তের আইনের অধীনে থাকবে। এতে বাড়াবাড়ি দেখা দিলে ক্ষুধা ও বিবাহের মাধ্যমে তা প্রতিহত করতে হবে। হাদীসে আছে–

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ـ

যুবকগণ, অবশ্যই বিবাহ কর। যে সক্ষম নয় সে যেন রোযা রাখে। রোযা তার জন্যে খাসী হওয়ার মত।

মুরীদের বিবাহ করা না করা

প্রথম অবস্থায় মুরীদের বিবাহের ঝামেলায় পড়া উচিত নয়। কারণ, এটা আখেরাতের পথে বাধা সৃষ্টি করবে। মুরীদ স্ত্রীর মহব্বতে আটকা পড়ে যাবে। এ বিষয় থেকে ধোকা খাওয়া উচিত নয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)